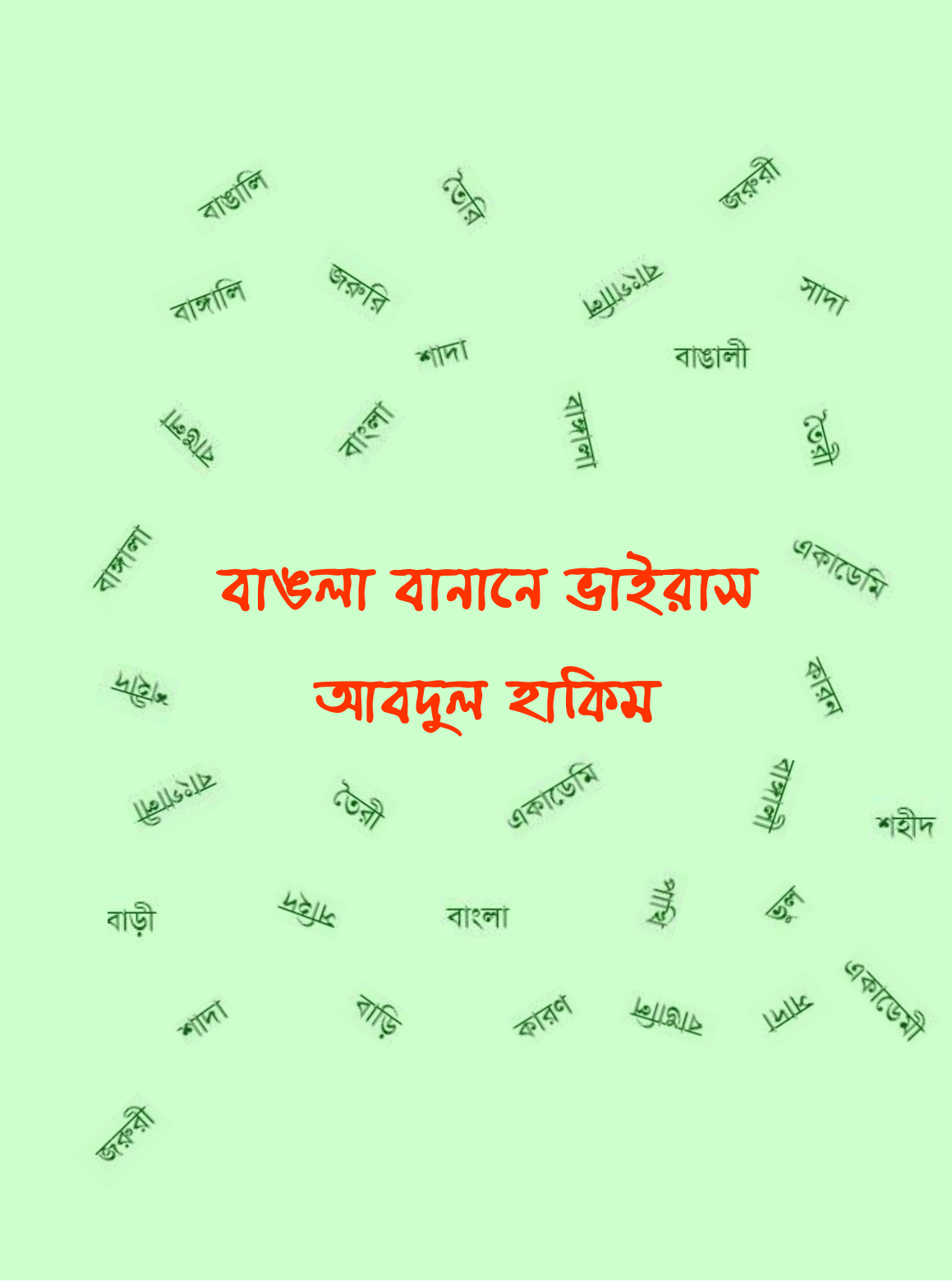

বাঙলা বানানে ভাইরাস

আবদুল হাকিম

বাঙলা বানানে ভাইরাস

আবদুল হাকিম

প্রকাসকঃ হুমায়রা জামান
ট্যালাহাসি, ফ্লোরিডা
ইউ এস এ ৩২৩০৩
প্রচ্ছদঃ হুমায়রা জামান
গ্রন্থস্বত্বঃ মৌ ও আবির
মুদ্রনঃ সাগর জামান
প্রকাসকালঃ ফেব্রুয়ারি ১, ২০০৮

বইটিতে

ঈ ঊ ণ ং শ

এই পাঁচটি অক্ষর ব্যবহার করা হয়নি

স্মরন

বাঙলা ভাষার প্রান
সালাম বরকত রফিক জব্বার
এবঙ
নাম না জানা আর এক গুচ্ছ
রক্তে ভেজা ফুল

লেখক পরিচিতি

সৈসব কেটেছে পিতার কর্মস্থল দেসের বিভিন্ন জায়গায়। স্কুল ও কলেজ জিবন জন্মস্থান মাগুরাতে। স্নাতকোত্তর ঢাকায়। ছাত্রজিবনে প্রথমে ছবি আঁকা, পরে নাটক, আবৃত্তি ও সাহিত্য চর্চা। ছবি আঁকা, নাটক ও আবৃত্তিতে পুরস্কার লাভ। সেই সুত্রে চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রকার আলমগির কবির পরিচালিত ঢাকা ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৭৪ সালে ফিল্ম এয়াপ্রিসিয়েসন কোর্স সমাপ্ত করেন। তারপর চলচ্চিত্রকার আলমগির কবিরের কয়েকটি ছবিতে সহকারি হয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা।

প্রথম গ্রন্থ, ছোটদের জন্য লেখা ***কেমন করে স্বাধিন হলাম*** প্রকাসিত হয় ১৯৮৯ সালে। এরপর প্রথম উপন্যাস ***এখনো গর্ভে তোমার*** প্রকাসিত হয় ২০০০ সালে। ২০০১ সালে প্রকাসিত হয় দ্বিতিয় উপন্যাস ***তখন***। তৃতিয় উপন্যাস ***কেন*** প্রকাসিত হয় ২০০২ সালে। কাব্য সঙ্কলন ***আকাস রঙ স্বপ্ন*** ইলেকট্রনিক সঙস্করনে প্রকাসিত হয় ২০০৭ সালে।

আবদুল হাকিম বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসি।

লেখকের অন্যান্য বই

- ❖ কেমন করে স্বাধিন হলাম (ছোটদের জন্য)
- ❖ এখনো গর্ভে তোমার
- ❖ তখন
- ❖ কেন
- ❖ কাব্য সঙ্কলন –আকাস রঙ স্বপ্ন (ইলেট্রনিক সঙস্করন)
- ❖ কাব্য সঙ্কলন (নির্মিয়মান)

প্রকাসকের কথা

ভাব প্রকাসের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো যোগাযোগ, যা হতে পারে লেখায় অথবা কথা বলায়। যোগাযোগের স্তরগুলো হলো,

১→ কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে চিন্তাকে কেন্দ্রিভুত করে বিষয় নির্বাচন করা;
২→ নির্বাচিত বিষয়ের কোন অঙসটুকু উপস্থাপন করা হবে তার যথার্থ চয়ন;
৩→ বিষয়টি কিভাবে উপস্থাপিত হবে তার ভাবনা;
৪→ উপস্থাপনাকে ছকে আবদ্ধ করা;
৫→ সরাসরি উপস্থাপনযোগ্য কিনা তার পর্যবেক্ষন ও সিদ্ধান্তগ্রহন
৬→ ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে অবসেষে বিষয়টির উপস্থাপন

সুতরাঙ ভাষা হচ্ছে একটি প্রযুক্তি যার প্রয়োগে মনের ভাব প্রকাসিত হচ্ছে এবঙ অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাই ভাষারও পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। তখন ভাষাটির প্রয়োগেও পরিবর্তন হতে পারে। কঠোর নিয়মে আবদ্ধ ভাষার নিয়িমবিধি মুক্তি লাভ করে হয়ে উঠে আরো সহজ, আরো সরল এবঙ জটিলতামুক্ত। যদি এ সকল উৎকর্ষ সাধিত না হয় অথবা বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে সৃষ্টি হয় প্রযুক্তির প্রয়োগগত স্থবিরতা যা পরবর্তিতে আনয়ন করে ভাষার বিলুপ্তি। এভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় ভাষাটি বিলুপ্ত হয়েছে বা অবলুপ্তির পথে দাঁড়িয়ে আছে অথবা সঙকির্ন পরিমন্ডলে টিকে আছে। জটিল নিয়মে আবদ্ধ নয় এমন ভাষাগুলো সঙকির্নতা অতিক্রম করে প্রবেস করে এমন এক জগতে যেখানে অধিক সঙ্খ্যক মানুষ সেই ভাষাটিকেই যেন বেছে নেয় ভাব প্রকাসের মাধ্যম হিসেবে। যে ভাষার প্রয়োগ যত সহজ, দুর্বোধ্যতা যত কম সে ভাষা ততই জনপ্রিয় এবং মানবসম্প্রদায় কর্তৃক গ্রহনযোগ্য।

তেমনি একটি ভাষা বাঙলা। যার প্রয়োগে সরলতা আনয়নের জন্য কিছু চিন্তা, যুক্তি, তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয় ঘটেছে জনাব আবদুল হাকিম রচিত ***বাঙলা বানানে ভাইরাস*** গ্রন্থে। লেখক বিনয়ের সাথে দাবি করেছেন তিনি পন্ডিতজন নন এবঙ জ্ঞান তার ক্ষুদ্র পরিমন্ডলেই আবদ্ধ। কিন্তু তারপরও তার মনের কিছু প্রস্ন এবঙ তার উত্তর খোঁজার সময়ে এই সিদ্ধান্তে তিনি এসে পৌঁছেছেন যে বাঙলা ভাষাটিকে আরো সহজভাবে সর্বস্তরের মানুষের কাছে উপস্থাপিত করার একটি উপায় নিসচই আছে। লেখক তার গভির অবলোকন এবঙ যুক্তিবোধের দ্বারা সেই উপায়ের সন্ধানও দিয়েছেন। যদিও বারবার তার বিনম্র দাবি তিনি পন্ডিতজন নন। তারপরও ভাষার মত প্রযুক্তিকে সহজ করে দেবার জন্য যে কৌসল তিনি আজ বলে দিয়েছেন তা বহু পন্ডিজনের দক্ষতাকে বহুমাত্রায় ছাড়িয়ে যায়। বিভিন্ন ভাষার সব্দ সম্ভারে গঠিত বাঙলা ভাষা প্রাচুর্যে পুর্ন। বাঙলা ভাষায় বিদেসি সব্দের আগমন যেমন সিমাহিন, সব্দ গঠনে বানান প্রয়োগে জটিলতাও সিমাহিন। আবদুল হাকিম দেখিয়েছেন বাঙলা বানানের সহজতর গঠন যা কিনা পাঁচটি অক্ষর বর্জনের মাধ্যমেও সম্ভব। ফলে যে কোন স্তরের সিক্ষিত মানুষ সজজভাবে বানান সেখার সুযোগ লাভ করবে। যে কোন স্তরের সিক্ষিত বলতে বুঝাচ্ছি যারা কিনা উচ্চসিক্ষায় অঙসগ্রহন করেননি তাদের কথা বা যারা কিনা সদ্য অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয়েছেন তাদের কথা। আর উচ্চসিক্ষায় অঙসগ্রহনকারিগন তো সবসময়ই সে জ্ঞান আহরনের সুযোগে সৌভাগ্যবান। ***সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়*** তাঁর ***ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*** গ্রন্থে বলেছেনঃ

"[২.১৪১] অনেক ভাষায় স্বর-বর্ণের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারনের উপরে অর্থের পার্থক্য নির্ভর করে; যেমন, ইংরেজীতে,

kin [খিন্]--হ্রস্ব ই--অর্থ 'সম্পর্ক,' keen [খী--ন] -- দীর্ঘ -ঈ……অর্থ 'তীক্ষ্ণ' ;

সংস্কৃত 'দি--ন (= দিবস), দী--ন (= দরিদ্র)'। বাঙ্গালা ভাষায় স্বর-বর্ণের হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণের উপরে শব্দের অর্থ নির্ভর করেনা।

[২.১৪৪] বাঙ্গালা উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘের এই পার্থক্য রক্ষিত না হওয়ার কারণে, বাঙ্গালা বানানেও এ বিষয়ে বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই; যথা, 'একটি–একটী; হাতি–হাতী; ঘড়ি–ঘড়ী; চুন–চূন; সুতা–সূতা; দীঘি–দিঘী–দীঘী।' এজন্য প্রায়ই হ্রস্ব-ই ও দীর্ঘ-ঈ-র অদল-বদল দেখা যায়, বিশেষতঃ শব্দের শেষে।

[২.১৪২] বাঙ্গালা ছন্দে এই জন্য স্বর-ধ্বনির হ্রস্বতা বা দৈর্ঘ্য বাঁধা-ধরা নহে, একই স্বর-ধ্বনি অবস্থান-গতিকে হ্রস্ব বা দীর্ঘ দুই-ই হইয়া থাকে। সংস্কৃতে 'আ, ঈ, ঊ,ঋ,এ,ঐ,ও,ঔ' সর্বদা দীর্ঘ, কিন্তু বাঙ্গালায় এগুলি হ্রস্বও হয়, দীর্ঘও হয়;..."

তাই আবদুল হাকিমের পরামর্স যদি হয় দীর্ঘ-ঈ এবং দীর্ঘ-ঊ বাদ দিয়ে জটিলতামুক্ত হওয়া, তা সানন্দে গ্রহনযোগ্য হতে পারে।

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে,

"[২.১৭] মূর্ধণ্য 'ণ' - এর ধ্বনি এখন বাঙ্গালায় লুপ্ত–সংস্কৃত শব্দে, এবং ক্বচিৎ প্রাকৃত-জ ও বিদেশী শব্দে'ণ' লিখিত হইলেও, বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ দন্ত্য 'ন'- এরে উচ্চারণ হইতে অভিন্ন; যথা -'রণ, চরণ,পুরাণ,করুণা; কাণ,পাণ,বাণান,সোণা (= কান, পান, বানান, সোনা).....ইত্যাদি।

শ,ষ,স–এই তিনটী ধ্বনির উচ্চারন এখন বাঙ্গালায় এক–ইংরেজীর sh এর মত।

বাঙ্গালায় 'ং ' ও 'ঙ' উচ্চারণে অভিন্ন হইয়া যাওয়ায়, একের বদলে অন্যের ব্যবহার খুবই সাধারণ; যথা--বাংলা–বাঙ্‌লা; রং, রঙ্‌--রঙের; ভাং–ভাঙড়' ইত্যাদি।

[২.৭২১] [১ক] খাঁটি বাঙ্গালা অর্থাৎ প্রাকৃত-জ শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ণ' -এর ব্যবহার ক্বচিৎ দেখা যায়–কিন্তু মূর্ধন্য 'ণ' এর বিশিষ্ট উচ্চারণ বাঙ্গালায় এখন অজ্ঞাত; এই সকল প্রাকৃত-জ শব্দে দন্ত্য 'ন' লিখিলেও কোনও ক্ষতি নাই–দন্ত্য 'ন' লেখাই বরং ভাল; .....। কতকগুলি শব্দে" মূর্ধন্য 'ণ' ও দন্ত্য 'ন' দুই-ই ব্যবহৃত হয়; যথা - 'রাণী–রানী;...কাণ–কান ... ইত্যাদি। বিদেশী শব্দেও কখনও কখনও সংস্কৃত শব্দের বানানের অনুকরণে 'ণ' লেখা হয় (সাধারণতঃ শব্দের শেষে), কিন্তু এ ক্ষেত্রেও দন্ত্য 'ন' লেখাই সমীচীন; যথা–'কোরাণ ('পুরাণ' শব্দের দেখাদেখি)–কোরান...; ইরাণ, তুরাণ–ঈরান, তূরান; .....ইত্যাদি।"

ডঃ সুনীতিকিমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, এই গ্রন্থে জনাব আবদুল হাকিম আরেক ধাপ এগিয়ে এইটুকুই বলতে চেয়েছেন যে, ণ,শ, ং বাদ দিলেও সদ্দ স্রবনে এবঙ বোধগম্যে হেরফের তো হবেই না, বানান আরো জটিলতামুক্ত হবে। আর এই চিন্তার ফলস্রুতিতেই আজ প্রকাসিত হল বাঙলা বানানে ভাইরাস গ্রন্থটি। এতে লেখকের দুটি প্রবন্ধ সন্নিবেসিত আছে। একটি ***বাঙলা বানানে ভাইরাস*** অপরটি ***তোমার আমার বাঙলা বানান***। প্রবন্ধ দুটি নিঃসন্দেহে লেখকের গভির অন্তর্দৃষ্টি ও সুক্ষ চিন্তার স্বাক্ষর বহন করে। লেখকের অন্যান্য প্রকাসিত গ্রন্থ ও কাব্য সঙ্কলনের মত এ প্রবন্ধ দুটিতেও ঈ,ঊ,ণ,ং,শ এই পাঁচটি অক্ষর ব্যবহার করা

হয়নি। গবেষনালব্ধ এই লেখা দুটি লেখকের অক্লান্ত পরিস্রমও লব্ধ। প্রবন্ধ দুটি পাঠ ও উপলব্ধি করে যদি কার্যক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ঘটাতে পারি তাহলে আমরাও এর সফলতার অঙসিদার হতে পারব।

সুক্ষ্ম অবলোকন সহজবোধ্য নাও হতে পারে। এর গ্রহনযোগ্যতা সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর হতে পারে। তারপরও বানানের সহজতর নিয়ম প্রয়োগে ভাষার সাথে একাত্ম হবার অবারিত দ্বার সবসময়ই উন্মুক্ত থাকবে। যদি বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ থাকতে আর ইচ্ছে না করে, পাঠক সমাজ নিসচই খুঁজে নেবে তার আবারিত উন্মুক্ত দুয়ার।

হুমায়রা জামান
ফ্লোরিডা
ইউ এস এ
জানুয়ারি ১৭, ২০০৮

একান্ত

প্রথম যেদিন লিখতে বসলাম, সেদিনই বাঙলা বানান নিয়ে হোচট খেলাম। বানান নিয়ে অস্থিরতা আমার আর কাটলো না। অনেক ভেবে চিন্তে আমার কাছে মনে হল, বাঙলা ভাষা ঈ ঊ ণ শ ং এই পাচটি অক্ষর ছাড়াও চলতে পারে। আমার প্রথম লেখা ছোটদের জন্য ***কেমন করে স্বাধিন হলাম*** ছাড়া পরের লেখাগুলোতে আমি ওই পাচটি অক্ষর আর ব্যবহার করিনি। বাঙলায় কেন ওই পাচটি অক্ষর লাগেনা তা বোঝাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আমি দুটি প্রবন্ধ ***বাঙলা বানানে ভাইরাস*** ও ***তোমার আমার বাঙলা বানান*** লিখে ফেললাম। কিন্তু লেখা দুটো প্রকাস আর করা হলনা। ভাগ্য ফেরাতে আটলান্টিক পাড়ি দিলাম। ভয় ছিল লেখা দুটো হয়তো হারিয়ে যাবে। তাই এখানে আসার আগে আমার প্রকাসিত অন্যান্য বইয়ের সাথে পান্ডুলিপি দুটোর কপি ঢাকা জাতিয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভস এবঙ বাঙলা একাডেমি গ্রন্থাগারে জমা দিয়ে এসেছিলাম।

অসাধারন এক ব্যক্তিত্ব কবি হুমায়রা জামান। অর কাছ থেকে তাগিদের পর তাগিদ আসতেই লাগলো। সেষে চার বছরের ধুলো ঝেড়ে, কিছু কাটাকাটি করে পান্ডুলিপিটা ওর হাতে তুলে দিলাম। নিজের কাজ ফেলে, অনেক পরিস্রম আর যত্নে ও লেখাদুটো ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে প্রকাস করল। কবি হুমায়রা জামানের তুলনা নেই। ওর কাছে আমি ঋনি হয়ে রইলাম। সাথে সাথে ডঃ চঞ্চল জামানের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ ওর সহযোগিতার জন্য।

ঢাকা জাতিয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভসের সহকারি পরিচালক মির সাহাবুদ্দিন এবঙ বাঙলা একাডেমির উপ-পরিচালক (গ্রন্থাগার) সাহিদা খাতুন ওই সময় আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন। ওদের কথা ভুলব না।

পাঠকদের মতামতের জন্য আমার চোখ কান খোলা রইল।

আবদুল হাকিম
৩৯২৫/বি, ক্লার্কস লেন
বাল্টিমোর, এম ডি ২১২১৫
ইউ এস এ
টেলিফোন ৪১০-৩১৮-৮১২৫
তারিখ ০১.০১.২০০৮

বাঙলা বানানে ভাইরাস

বড় সাহেব ক্রুদ্ধ মেজাজে হুঙকার দিয়ে বললেন , ডাকো ওই কেরানি বেটাকে।
কেরানি বেচারা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বড় সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগলো।
চোখদুটো রাঙিয়ে বড় সাহেব এবার কেরানি বেটার দিকে তাকিয়ে বললেন, লেখাপড়া কি ঘাস খেয়ে সিখেছেন?
স্যার---
কি স্যার স্যার করছেন অ্যা। এটা কি লিখেছেন? বগুড়া। ইঙরেজিতে বগুড়া কি ভাবে লেখে অ্যা? দেখেন। ভাল করে দেখে তারপরে সেখেন। যান।
ফাইলটা বড় সাহেব কেরানি সাহেবের দিকে ছুড়ে দিলেন।
কেরানি সাহেব এবার তাকিয়ে দেখলেন তার লেখা BOGURA বানানটি লাল কালি দিয়ে কেটে বড় সাহেব সুদ্ধ করে লিখে দিয়েছেন BOGRA । কিছুক্ষন হা করে দাড়িয়ে দাড়িয়ে ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, তাইতো, বস ইজ অলওয়েজ কারেক্ট। একটা সালাম দিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে এলেন কেরানি সাহেব।

এক সময়ে আমরা ইঙলিসে ঢাকা বানান লিখতাম DACCA। আর এখন লিখি DHAKA । উচ্চারনে আমরা বলতাম ঢাকা। লিখতে গিয়ে লিখতাম ড্যাকা। ব্যাপারটা হাস্যকর বলেই মনে হয়। তবে আনন্দের কথা, আমাদের বোধদয় হয়েছে। আমরা আমাদের রাজধানির ইঙলিস বানান ঠিক করে নিয়েছি। তবে এ কাজটির জন্য কিন্তু বাহবা পেয়েছেন বাঙলাদেসের তত্কালিন প্রেসিডেন্ট হোসেইন মোহাম্মদ এরসাদ। পরামর্সটি যিনিই দিয়ে থাকেননা কেন, কৃতিত্বটা কিন্তু এরসাদ সাহেবেরই। তিনি আদেস দিলেন, ব্যাস হয়ে গেল। কেউ টু সব্দটি করলো না। বুদ্ধিজিবি পরিপুর্ণ আমাদের এই বাঙলাদেস। তারা কিন্তু এ কাজটি অনেক আগেই করতে পারতেন।

ঢাকা বানান না হয় সুদ্ধ হল। কিন্তু বগুড়া , সিলেট, ময়মনসিঙহ, যসোর, চট্টগ্রাম এদের কি হবে? ইঙলিসে এ বানানগুলো সঠিক করে লেখার জন্য কি আর একজন খাকি পোষাকধারি সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপতির অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাদের। কেরানি সাহেবরা আর কতকাল বড় সাহেবদের চোখ রাঙানি দেখবেন? সেই কবে ফিরিঙ্গি প্রভুরা আমাদের দেস সাসন করতে এসে তাদের সুবিধার জন্য আমাদের বিভিন্ন জায়গার নামগুলো বিকৃত করে গেছেন। আমরা প্রভুদের সেই কৃপা আজও ভুলতে পারিনি। ভাগ্যিস MAGURA বানানটির প্রতি প্রভুদের দৃষ্টি পড়েনি, নয়তো ওটা হয়ে যেত MAGRA । এমনকি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রান, রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামও তারা বিকৃত করে গেছেন। তারা লেখেন RABINDRANATH TAGORE । উচ্চারনের সুবিধার জন্য তারা হয়তো THAKUR কে TAGORE বলেন। কিন্তু তাই বলে আমরা কি ভাবে ঠাকুরকে ট্যাগোর বলি বা লিখি । ইঙরেজিতে আমাদের THAKUR লিখতে বা বলতে তো কোন অসুবিধা নেই।

ইঙলিস বানানের বেলায় না হয় ফিরিঙ্গি প্রভুদের কথা বলে পার পেয়ে গেলাম। কিন্তু বাঙলা। বাঙলা বানানের বেলায় কি হবে? বাঙলা বানান ভুল হবার কারনে অবস্য কেরানি সাহেবকে বড় সাহেবের চোখ রাঙানি দেখতে হবে না, কারন বড় সাহেব নিজেও বাঙলা বানান লিখতে গিয়ে মাঝে মাঝে বিব্রত হয়ে পড়েন। তাতে কোন অসুবিধে নেই, কারন এই বিব্রত বোধ বড় সাহেবের জন্য বাঙলা চর্চা না থাকার এক অহঙ্কার।

বাঙালি, বাঙালী, বাংগালি, বাংগালী, বাঙ্গালি, বাঙ্গালী। এর কোনটি সুদ্ধ বানান? আমরা জাতিতে সমৃদ্ধ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একটি সমৃদ্ধ জাতির পরিচয় লিখতে গিয়ে প্রথমেই হোচট খেতে হয় তার বানান নিয়ে। একটি জাতির নামের বানান কি ভাবে ছয় রকম হতে পেরে? এবঙ ছয়টি বানানই কিভাবে সুদ্ধ হতে পারে? এ এক গোলক ধাধা। এর যে কোন একটিকে যদি সুদ্ধ ধরে নিই, তবে বাদ বাকি পাঁচটি অসুদ্ধ। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। সবগুলো বানানই প্রয়োগ হতে দেখা যায়। আবার বাংলা, বাঙলা, বাঙ্গলা,বাঙ্গালা। আমাদের প্রানপ্রিয় মাতৃভাষা। সালাম বরকত রফিক জব্বারের বাঙলা ভাষা। যে ভাষা আজ পুরো বিস্ব জুড়ে সমাদৃত। এখানেও পাওয়া যাচ্ছে চার রকম। এ ক্ষেত্রেও একই কথা।

এখানে একটি উদাহরন দেই। *তবু বাংলা কাগচে ইংরেজির অনুকরণ করে সেগুলি ছাপে। যেমন ধরুন, অমুক জাহাজ অমুক স্থল থেকে এসেচে। অমুক জাহাজ অমুক দিনেতে কলকাতা ছেড়ে ইংলন্ডে যাবে। এই সংবাদ পাঠে বাঙালীর কি উপকার? আমাদের আচার-ব্যবহার সমুদয়ই ইংরেজ জাতি হতে ভিন্ন। সুতরাং বাঙলা কাগচে বাঙ্গালার নিজস্ব খবর,-----।* আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল সুনিল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস ***সেই সময়*** , পৃষ্ঠা -৫৮২। এটা একটা সঙলাপ। যিনি এই সঙলাপ উচ্চারন করেছেন , তার উচ্চারন নিস্চই সব সময় একই রকম হবার কথা। অথচ একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব সঙলাপটিতে বাঙলা বানান তিন রকম লেখা হয়েছে। যেহেতু তিন রকম বানানই আমরা ব্যবহার করে আসছি, তাই এমনটি হওয়া বিচিত্র নয়। এখানে আরও কিছু উদাহরন দেয়া যেতে পারে। বাঙলা একাডেমি থেকে প্রকাসিত মনসুর মুসা রচিত দুটি বই, ***প্রাথমিক বাঙলা সাংগঠনিক পাঠ*** ও ***বাঙলা পরিভাষা ইতিহাস ও সমস্যা*** । এখানে বই দুটির নাম করনে *বাঙলা* লিখতে গিয়ে ঙ ব্যবহর করেছেন। কিন্তু বাঙলা একাডেমি'র বাঙলা লিখতে গিয়ে ং ব্যবহার করেছেন। লেখকের আর একটি বই, ***ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*** । বইটির চমতকার প্রচ্ছদের একটি লাইন এভাবে লেখা হয়েছে, ***বাঙলা দেশের ভাষা বাঙলা*** । আবার, বদরুদ্দিন উমর রচিত ***সংস্কৃতির সংকট*** বইটির পাতায় আমরা বাঙলাদেস কথাটির বানান দুরকম দখতে পাই। যেমন, *বাঙলাদেশ* এবঙ *বাংলাদেশ* । সুনিল গঙ্গোপাধ্যায় তার ***পূর্ব-পশ্চিম*** উপন্যাসটিতে বাঙলাদেস লিখতে গিয়ে এক জায়গায় ং, অন্য জায়গায় ঙ ব্যবহার করেছেন। পৃষ্ঠা ৩৩৪ ও ৪৩০। এক্ষেত্রে সহিদ জননি জাহানারা ইমাম তার ***একাত্তরের দিনগুলি*** বইটিতে বাঙলাদেস বানান লিখতে গিয়ে সবসময় ঙ ব্যবহার করেছেন। তিনি লিখেছেন *বাঙলাদেশ*। এখন *বাঙলা* সব্দটির দুই ধরনের বানান প্রসঙ্গে যদি কেউ প্রস্ন তোলেন, তাকে কি দোষ দেয়া যাবে?

বানানের এই বিভ্রাট পুষে না রেখে এর সহজ কোন সমাধান খুজে পাওয়া যায় কিনা তা একটু ভেবে দেখলে বোধ হয় বড় কোন ক্ষতি হবার সম্ভবনা নেই। একদম সহজ ভাবে দেখতে গেলে হয়তো একটা সমাধানে পৌছানো সম্ভব। আর যদি ব্যাকরন বা ধ্বনিতত্ত্বের কঠিন পান্ডিত্যপুর্ন হিসেব নিকেসের নিক্তিতে পরিমাপ করতে যাই তাহলে আর হল না। সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যাবে। পরিবর্তন বা সঙ্স্কার কোনদিনই প্রচলিত নিয়ম কানুন বা নিতিকথা মেনে হয় না। এর জন্য চাই বিপ্লব। বাঙলা ভাষার সঙ্স্কারের ক্ষেত্রেও চাই বিপ্লব। আর এই বিপ্লব ঘটাতে হলে সুধু ইচ্ছেসক্তিই যথেষ্ট।

বাঙলা ভাষা বা সাহিত্যের অতিতের দিকে তাকালে দেখা যায়, এমন এক সময় ছিল যখন গদ্য সাহিত্যের কথা কেউ ভাবতেও পারতনা। সাহিত্য বলতে ছিল সুধু পদ্য। কিন্তু সময় বসে থাকল না। তার নিজস্ব তাগিদে গদ্যকে ঠিকই টেনে আনল। গদ্য সাহিত্যে সাধু ভাষাতো বটেই, তার পরেও কঠিন দাতভাঙ্গা বাঙলা লেখার প্রতিযোগিতা চলতে থাকলো বহু যুগ ধরে। অবসেষে এলেন প্যারিচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) তার ***আলালের ঘরে দুলাল*** নিয়ে। প্রথমবারের মত তিনি ব্যবহার করলেন কথ্য ভাষা তার উপন্যাসে। ব্যাস, আর যায় কোথায়। হায় হায়, গেল গেল। সাধারন মানুষের মুখের ভাষায় সাহিত্য রচনা! কথ্য ভাষায় উপন্যাস! কি সর্বনাস। সাহিত্যের মান একেবারেই ধুলোয় মিসিয়ে দিল ব্যাটা। ব্যাটাকে ধর। একঘরে কর। কিছুদিন চললো বাক বিতন্ডা। কাদা ছোড়াছুড়ি। সময়ের সাথে সাথে যাদের বোঝার তারা ঠিকই বুঝলেন। আর গোঁড়াপন্থিরা আঁকড়ে ধরে রাখলেন তাদের গোঁড়ামিকে। স্বয়ঙ রবিন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন ব্যাপারটা। তাইতো তার সাহিত্য সমুদ্রে সাধু ও চলিত দু'রকম ভাষার প্রয়োগই দেখা যায়। প্রথম দিককার লেখায় সাধু এবঙ পরে এসে চলিত। তিনি

নিঃসন্দেহে দারুন বুদ্ধিমান ছিলেন, তাইতো সময়ের দাবিকে অগ্রাহ্য করেননি। পাসাপাসি সে সময়ের অনেক বাঘা বাঘা কবি সাহিত্যিক আর পন্ডিতরা প্যারিচাঁদ মিত্রের মত গ্রহন তো করেনইনি, বরঙ তাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস তাদের পক্ষে কথা বলে না। এরপর থেকে সুরু হল চলিত ভাষা। সাধু'র পাসাপাসি চলিত। সময় যত গড়িয়ে যায় ততই চলিত ভাষার পাল্লা ভারি হয়ে আসে। তারপর এক সময় হারিয়ে যায় সাধু ভাষা। মহাকবি মাইকেল মধুসুদন দত্তকেও একই সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়েছিল। তাঁর নাটক বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ দেখে তত্কালিন গোঁড়াপন্থিরা বিলেতি স্টাইলের ধুয়ো তুলে নাক সিটকেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস বলে, মাইকেলের নাটক বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ, বাঙলা ভাষা, সাহিত্য বা সঙস্কৃতিতে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিল। যুগে যুগে এভাবেই ভাষার আধুনিকায়ন হয়ে থাকে। যুগের দাবি মেনে নেয়াইতো বুদ্ধমানের কাজ। সুধু তাই নয়, দাড়ি কমা সেমিকোলন, এই যতি চিহ্নগুলোও কিন্তু গোড়ার দিকে ছিল না। সময়ের প্রয়োজনেই এগুলো এসেছে। উদাহরন, ইস্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত ***বেতাল পঞ্চ বিংশতি*** । অথবা আরবি ভাষার প্রথম দিককার কোন রচনার দিকে চোখ ফেরালেও দেখতে পাব, তখন জের জবর পেস ইত্যাদির কোন ব্যবহার ছিল না। সময়ের প্রয়োজনেই এগুলো এসেছে।

তবে হ্যা, বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সেকালের পন্ডিতরা বহু বিদেসি সব্দ, বিসেষ করে সঙস্কৃত সব্দ বা অক্ষরকে বাঙলা ভাষায় ঢুকিয়েছেন। এবঙ বাঙলা ভাষায় ওই সব সব্দ বা অক্ষর ব্যবহারের একটা নিতিমালা দিয়ে গেছেন। কিন্তু সময় অনেক গড়িয়েছে। এখন আর ওই সব্দ বা অক্ষরগুলো বিদেসি অথবা সঙস্কৃত সব্দ বা অক্ষরের পরিচয়ে বসে নেই। ওগুলো এখন বাঙলার নিজস্ব সম্পদ। এখানে বদরুদ্দিন উমর রচিত ***সংস্কৃতির সংকট*** বইটির ৬৭ পৃষ্ঠা থেকে দু'টি লাইন আমরা দেখতে পারি। তিনি লিখেছেন, *প্রায় আড়াই হাজার আরবী ফারসী তুর্কী শব্দ কয়েক শতকের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষায় সহজ ভাবেই প্রচলিত হয়ে এসেছে এবং সেগুলি বাংলার নিজস্ব সম্পদেই পরিণত হয়েছে।* বাঙলা ভাষা লেখা- পড়ার ভাষা হিসেবে সমৃদ্ধ হয়েছে অনেক পরে একথা সত্যি, কিন্তু মানুষের মুখের ভাষা হিসেবে এ ভাষা বেস পুরনো। পক্ষান্তরে সঙস্কৃত ভাষা সুধু পন্ডিত জনের পান্ডিত্য চর্চারই ভাষা। এ ভাষা কোনদিন কোন মানুষের মুখের ভাষা ছিলওনা, ভবিষ্যতেও কোন মানুষের মুখের ভাষা হবেও না। আর তাই সঙস্কৃত অত্যন্ত উচুমানের ভাষা হওয়া সত্বেও বর্তমানে তার প্রয়োজন হারিয়েছে। যে ভাষার নিজেরই কোন অস্তিত্ব নেই, সেই ভাষার পরিচয়ে আজও বাঙলা ভাষায় কিছু সব্দ বা অক্ষর চিহ্নিত হবার কোন প্রয়োজন নেই। এতে সুধু জটিলতাই বাড়বে।

অক্ষর যেহেতু ভাষার অন্যতম প্রধান উপাদান,তাই ভাষা আধুনিকায়নের ধাক্কা অক্ষরকেও সইতে হবে বৈকি। বাঙলা বা বাঙালি কে আমরা উচ্চারন করতে গিয়ে খুব কম ক্ষেত্রেই বাঙ্গলা বা বাঙ্গালি উচ্চারন করে থাকি। বাঙ্গলা বা বাঙ্গালি বলতে বা লিখতে গিয়ে ঙ এবঙ গ যুক্ত ভাবে এসে যাচ্ছে। যেখানে বাঙলা বা বাঙালি উচ্চারনে আমরা অভ্যস্ত এবঙ এই বানান টাকে মেনে নিয়েছি, তবে কেন আর মাঝখানে গ কে নিয়ে টানাটানি। এছাড়া বাঙলা বা বাঙালি লিখতে গিয়ে আরো দুটি অক্ষর নিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে ং এবঙ *ঈ* । ং এর বদলে যদি ঙ এবঙ *ঈ*'র বদলে যদি ই ব্যবহার করে কাজ চালানো যায় তবে ক্ষতি কি। এখানে একটা উদাহরন দেই, *হ্যাঁ বলছি। যদি সাহস থাকে , যা করতে বলছি কর। সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকবি না। সং দেখতে আর ভাল লাগে না।* নন্দিত কথা সাহিত্যক হুমায়ুন আহমেদের ***অপেক্ষা*** উপন্যাসের একটি সঙলাপ। পৃষ্ঠা-১৪৪। এখানে তিনি সং লিখতে গিয়ে ং ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যখনই সব্দটির সাথে এ-কার ব্যবহার করতে হয়েছে তখনই ং এর বদলে ডাক পড়েছে ঙ এর। নাসরিন জাহান তার ***উড়ুক্কু*** উপন্যাসটিতেও একই কাজ করেছেন। পৃষ্ঠা-১৮৭ ও ১৮৮। কেন ? এই কেন'র উত্তর নিস্চই পন্ডিত জনেরা দিতে পারবেন, কিন্তু আমাদের মত সাধারন বাঙালিদের প্রস্ন থেকেই যাবে। তবে আমরা সুধু এটুকু বলতে পারি যে, ঙ দিয়ে *সঙ* এবঙ *সঙের* দুটো সব্দই লেখা যায়, কিন্তু ং দিয়ে *সং* লেখা যাচ্ছে কিন্তু *সঙের* লেখা যাচ্ছেনা। এমনি ভাবে বাঙলা ভাষায় ং যত জায়গায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার সব জায়গাতেই ঙ ব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু যত জায়গায় ঙ ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার প্রত্যেক জায়গায় ং ব্যবহার করা সম্ভব নয়। ং এর বদলে *ঙ* যে ইচ্ছে করলে অনেক জায়গাতেই ব্যবহার করা যায় রবিন্দ্রনাথের ***শেষের কবিতা*** তার একটি বড় উদাহরন। তিনি কিন্তু অনেক আগেই রঙ এবঙ রঙের এ দুটো সব্দেই ঙ ব্যবহার করে

গেছেন। মানিক বন্দোপাধ্যায়ও ঙ দিয়ে রঙ লিখেছেন। উদাহরন- ***পুতুল নাচের ইতিকথা***। লিখতে গিয়ে দুটো অক্ষরের কাজ যদি একই হয়, তবে আর ং এর দরকারটা কি?

উচ্চারন করতে গিয়ে ই এবঙ *ঈ* তে যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে তা সুধু মাত্র ই দিয়েও বহাল রাখা সম্ভব। উচ্চারনের ক্ষেত্রে অনেক দুরবর্তি *শ* কে দিয়ে যদি ছ এর কাজ চালানো যায়, তবে নিকটবর্তি ই কে দিয়ে কেন *ঈ* এর কাজ চালানো যাবে না। মাত্র কয়েকটি সন্দের জন্য এই *ঈ* কে পুষে রাখার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়না। এর ফলে বাঙলা ভাষা হবে অনেক গতিসিল, ঝামেলামুক্ত এবঙ ভুল হবার আসঙ্কামুক্ত। আমরা আমাদের ভাষাকে সহজ সরল ও জটিলতামুক্ত দেখতে চাই এবঙ সচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করতে চাই। সমস্যা সুধু একটাই, আর তা হল এতদিনের অভ্যেসটাকে বদলানো। তাই বাঙলা এবঙ বাঙালি এ দুটো বানানকেই চালু রেখে বাকিগুলোকে বাদ দেয়াইতো ভাল। এই বানানটিকে মেনে নিলে অনেকদিক থেকেই সুবিধা হবে। আর বাঙলা যেহেতু ঙ দিয়ে লিখতে পারছি তাই বাঙলাদেস বানানেও ঙ ব্যবহার করায় কোন অসুবিধা নেই।

এমনি ভাবে *ঈ* এবঙ ং দিয়ে অন্যান্য যে সন্দগুল লিখে থাকি সেগুলো ই এবঙ ঙ দিয়ে লেখা যেতে পারে। পাসাপাসি এখানে আমরা এ কথাটিও বলতে পারি যে, *ঈ* এবঙ ং কে বাদ দিয়েও বাঙলা ভাষা চলতে পারে। যেমন ধরা যাক, জাতি। এখানে ই কার ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যখন জাতিয় কথাটি লিখছি তখন *ঈ* কার এসে হয়ে যাচ্ছে *জাতীয়*। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমরা যদি ই কার দিয়ে জাতিয় লেখার অভ্যাসটা করতে পারি, কিছুদিন পরে ওটাই সুদ্ধ হয়ে যাবে। বানান ভুলের বড় একটা সঙ্কা থেকে আমরা মুক্ত হব। আবার দেখা যাক রবিন্দ্র সন্দটি। আমরা রবি লিখতে গিয়ে ই-কার ব্যবহার করছি, যেই লিখছি রবিন্দ্র , *ঈ*-কার যুক্ত হয়ে হয়ে যাচ্ছে *রবীন্দ্র*। পন্ডিতদের স্থান অনেক উপরে । কিন্তু সাধারন মানুষ, যারা বাঙলা ব্যাকরনের সন্ধি বিচ্ছেদ বা প্রত্যয় সম্বন্ধে জানেননা, তারা *রবীন্দ্র* বা *জাতীয়* বানানের কারন বুঝতে পারবেননা। অথচ তাদেরও বাঙলা ভাষা ব্যবহার করতে হবে । তাই এত জটিল ফর্মুলার দরকারটা কি? এ দুটি সন্দের ক্ষেত্রে ই-কার ব্যবহার করলে মানে বুঝতে পারবেননা এমন একটি লোক খুজে পাওয়া যাবে কি? যদি সত্যি পাওয়া না যায়, তবে *ঈ*-কারের দরকার কি? কেন এই জটিলতা? এতে সাধারন মানুষ যেমন অনেক স্বস্তি পাবেন, তেমনি লেখকদের কলমও আটকে যাবে বলে মনে হয়না। যেমন জরুরি সন্দটি। এই সন্দটি লিখতে গিয়ে আমরা আজকাল ই-কার এবঙ *ঈ*-কার উভয়ই দেখতে পাই । অভিধানে কিন্তু *ঈ*-কারই আছে। তারপরও ই-কার ব্যবহার করা হচ্ছে। হুমায়ুন আহমেদের ***তেতুল বনে জোছনা*** উপন্যাসটির কথা ধরা যাক। তিনি বইটিতে জরুরি বানান লিখতে গিয়ে অনেকবার ই-কার ব্যবহার করেছেন। একই উপন্যাসে তিনি মেহেরবানি সন্দটি দুই জায়গায় লিখতে গিয়ে এক জায়গায় ই-কার এবঙ এক জায়গায় *ঈ*-কার ব্যবহার করেছেন। পাসাপাসি এক জায়গায় ন এবঙ অন্য জায়গায় *ণ* ব্যবহার করেছেন (***তেতুল বনে জোছনা*** পৃষ্ঠা-৫৯)। কাজটি যদি তিনি সচেতন ভাবে করে থাকেন তবে বুঝতে হবে তিনি *ঈ*-কারের প্রয়োজনিয়তা অনুভব করছেন না। আবার যদি অবচেতন মনে বা মুদ্রন বিভ্রাটের কারনে হয়ে থাকে তাহ্লেও আমাদের কারো সন্দ দুটির মানে বুঝতে অসুবিধা হয়নি। আমরা এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাইনি। অর্থাত, বানানটি আমরা মেনে নিয়েছি। সাধারন পাঠকের কাছে কোন সমস্যা হয়নি। এমনিভাবে তৈরি সন্দটির ক্ষেত্রেও একই কথা। ই-কার ও *ঈ*-কার উভয়ই চলছে। রবিন্দ্রনাথ কিন্তু তৈরি লিখতে ই-কার ব্যবহার করে গেছেন। আবার ধরা যাক *জানুয়ারি* বা *ফেব্রুয়ারি* বানানের কথা। অনেক আগে থেকেই আমরা দেখে আসছি এ দুটি বানানে *ঈ*-কার ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু আনন্দের কথা, আজকাল জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি লিখতে প্রায়ই ই-কার ব্যবহার হচ্ছে। ফলে এই মুহুর্তে দুটি বানানই চলছে। খুব তাড়াতাড়িই এ দু'টি বানান থেকে *ঈ*-কার একেবাড়েই ঝরে পড়বে, একথা জোর দিয়েই বলা যায়। এখানে আরও কিছু উদাহরন। নাসরিন জাহানের উপন্যাস ***উদ্বৃত্ত***। ১৯২ পৃষ্ঠায় তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, *যাহোক, শহীদ মিনারের কাছে এসে ...../ ... ... /... ... .../ কিন্তু আমার মধ্যে ..... খাড়া শূন্য শহিদ মিনার অন্য সময় ...../* এখানে তিনি সহিদ মিনার লিখতে গিয়ে একবার ই-কার, আর একবার *ঈ*-কার ব্যবহার করেছেন। আবার সুনিল গঙ্গোপাধ্যায় তার বিখ্যাত উপন্যাস ***পূর্ব-পশ্চিম*** ২য় খন্ডে লিখেছেন, ... *চায় রক্তস্নাত শহিদ। মা মনি আমরা সবাই শহিদ হয়ে যাবো...../* পৃষ্ঠা- ৩০৩। *প্রথম শহিদ বাংলাদেশের মেয়ে.....*

একাত্তরের এক শহিদ মেয়েকে নিয়ে লেখা.....। পৃষ্ঠা-৫৬৭। *মনুমেন্ট হয়ে গেছে শহিদ মিনার।* পৃষ্ঠা-৫৮৪। সুনিল গঙ্গোপাধ্যায় সহিদ লিখতে ই-কার ব্যবহার করেছেন। আমরা তার এই বানান নিয়ে কোন আলোচনা বা হৈ চৈ করছিনা। কারন অর্থ বুঝতে আমাদের কারো কোন অসুবিধা হয়নি। অর্থাত ওই বানান আমরা মেনে নিয়েছি। অভিধানেও ই-কার ও *ঈ*-কার, দুই ভাবেই লেখা হয়েছে। একই সন্দে দু'রকম বানান জটিলতাই সৃষ্টি করে। তাই *ঈ*-কার ঝেড়ে ফেলে , ই-কার রাখাই উচিত হবে। তাহলে *ঈ*-কারের আর প্রয়োজন কি? তেমনিভাবে *একাডেমি* বানান লিখতে গিয়েও যে *ঈ*-কারের বদলে ই-কার এসে যাবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ইতোমধ্যে যা সুরু হয়ে গেছে। যেমন-ডঃ হুমায়ুন আজাদ তার ***আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম*** বইটির ১০১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *.....বাঙলা একাডেমির মহাপরিচালককে .....।* এছাড়া আধুনিক পত্র পত্রিকার পাতায় লক্ষ্য করলে একাডেমি বানানে ই-কারই দেখা যায়। কারন বাঙলা ভাষায় মনে হয় *ঈ*-কারের আর কোন দরকার নেই। তবে আমাদের একটু বেসিই সময় লাগে। সেই কবে রবি ঠাকুর গাড়ি বাড়ি পাখি বানানে ই-কার লাগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আজও আমারা এই বানানগুলো লিখতে গিয়ে ই-কার না *ঈ*-কার হবে তা নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলি। যেমন কবি সমুদ্র গুপ্তের ***সাত সমুদ্র*** কাব্য গ্রন্থের একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন , *.....তুমি আমার বাড়ীতে এসো।* পৃষ্ঠা-৪২। অন্য একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন, *.....বিশাল বাড়ি কপট বিহীন.....।* পৃষ্ঠা -৪৫। এখানে তিনি বাড়ি লিখতে একবার ই-কার, আর একবার *ঈ*-কার ব্যবহার করেছেন। যতদিন পর্যন্ত *ঈ*-কার থাকবে ততদিন এই তালগোল পাকানো থেকে আমাদের রেহাই নেই।

ঊ এর ক্ষেত্রেও একই কথা বলতে হয়। উর্মি বা উষা লেখার জন্য একটা অক্ষর ধরে রাখা, একটা বোঝা ছাড়া আর কিছুনা। উ দিয়ে উর্মি বা উষা লিখলে মনে হয় কেউ অর্থ হিসেবে সান্ত জলধারা বা সন্ধ্যা বুঝে নেবেননা। বাক্যের ভিতর সন্দ দুটি থাকলে তো না বোঝার কোন প্রস্নই আসেনা। সুনতে আর বলতে যদি কোন অসুবিধা না হয় তবে লিখতে বা পড়তে অসুবিধাটা কোথায়? তাহলে এ কথা বলা যায় যে, ইচ্ছে করলে বাঙলা বর্নমালার কলেবর হ্রাস করতে *ঊ*কেও সরিয়া রাখা যায়।

এবার ণ। আমার মনে হয় ণ কে বাদ দেয়া সবচেয়ে সহজ। উচ্চারনের ক্ষেত্রে ণ আর ন এর পার্থক্য বুঝতে হলে মুখের সামনে পাতলা কাগজ রেখে উচ্চারনের প্রাকটিকাল ক্লাস করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। অতএব, ণ এর স্থলে ন দিয়ে কোন সন্দ যদি বলি তাতে অর্থ বোঝা যাবেনা, একথা বিস্বাসযোগ্য নয়। অতএব, লেখা বা পড়ার ক্ষেত্রেও ণ কে বাদ দেয়া সম্ভব। এতে কোমলমতি ছেলেমেয়েরা স্যারের ধমক খাওয়া থেকে অনেকাঙসে বেচে যাবে।

বলা হয়ে থাকে স এর উচ্চারন ছ এর মত। স এর উচ্চারন যদি ছ এর মত হয় তবে ছ এর উচ্চারন কিসের মত হবে? নাই এর মত? এবার আমরা কয়েকটি সন্দের দিকে একটু লক্ষ্য করি। আশ্রয়, সাশ্রয়, প্রশ্রয় শ্রুতি, শ্রেষ্ঠ, শ্রেয়, শ্রবন, শ্রাবন, শৃগাল, *শ্রী*, শ্রাবন্তি, শ্রাবস্তি, শ্রান্তি, শ্রম, শ্রদ্ধা, শ্রাদ্ধ, শ্রমিক, শ্রোতা। এমনি সন্দ আরো আছে। এ সন্দগুলো *শ* দিয়ে লেখা হয়েছে। কিন্তু উচ্চারন হচ্ছে ছ এর মত। তাহলে স এর উচ্চারন ছ এর মত হয়, এ কথাটি ধোপে টিকছে না। ধ্বনিতত্ত্বের হিসেবে এই সন্দগুলোর *শ* এর উচ্চারনের সাথে ছ এর উচ্চারনে সামান্য পার্থক্য হয়তো খুজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই সামান্য পার্থক্যের জন্য খুব কাছের ছ কে দুরে ঠেলে দিয়ে উচ্চারনের ক্ষেত্রে অনেক দুরের *শ* কে নিয়ে এসে জুড়ে দেবার প্রয়োজন কি? ছ উচ্চারন করতে গিয়ে যদি *শ* ব্যবহার করতে হয়, তবে ছ রয়েছে কি সুন্দর একটা দেহবল্লরি নিয়ে নাচের মুদ্রায় দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য? এতে কি ছ কে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না? আর যদি ওই সন্দগুলো লিখতে স একটা না লাগালে মহাভারত অসুদ্ধ হয়েই যায়, তবে স লাগালেইতো হয়। স্রোত বানান যখন আমরা স দিয়ে লিখতে পারছি, তখন *শ্রোতা* বানানটাও না হয় স দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখিনা কি হয়। যদিও এটাও হবে অনুচিত। কারন এখানেও স'র উচ্চারন কিন্তু আমরা ছ'র মতই করছি। স কিন্তু অধিকাঙস ক্ষেত্রেই নিজের উচ্চারন ঠিক রেখেই ব্যবহৃত হয়। তবুও স'র বোঝা একটা কমাতে ওই সন্দগুলোতে *শ*'র বদলে স ব্যবহার না হয় করাই গেল। একই কাজ করতে গিতে তিন রকম স ষ *শ* দরকারটা কি ? বলতে বা সুনতে যদি তিন স'র পার্থক্যের প্রয়োজন না হয়, তবে সুধু

লিখতে বা পড়তেই বা দরকার কি? এতে সুধু জটিলতা বাড়ে। না হয় সুদ্ধ, না হয় অসুদ্ধ। যেমন ধরা যাক সাদা সব্দটির কথা। আমরা জানি, সাদা সব্দটি স দিয়েই লেখা হয়ে থাকে। অভিধানেও কিন্তু তাই পাওয়া যায়। কিন্তু যখন দেখি বাঙলা সাহিত্যেই অন্যতম কবি সামসুর রাহমান সাদা লিখতে গিয়ে *শ* ব্যবহার করছেন তখনতো বিভ্রান্ত না হয়ে উপায় নেই। কোনটা ঠিক? অভিধান, না কবি সামসুর রাহমান? আর পুলিস বানান লিখতে গিয়ে স এবঙ *শ* উভয়ই ব্যবহার করছি। এখানে কথা হতে পারে পুলিস সব্দটি খোদ বাঙলা নয়। বিদেসি। হোকনা। তাহলেতো আরো সুবিধাই হল। তবে বাঙলাতে যখন সব্দটি ব্যবহার করতেই হচ্ছে তখন এটাকেও একটা বাঙলা সব্দ হিসেবে স্বিকৃতি দেবার সময় বোধ হয় এখন এসেছে। উদাহরনের ফিরিস্তি বাড়াতে গেলে অনেক বাড়ানো যাবে। কিন্তু তাতে সুধু লেখার কলেবরই বাড়বে।

এখানে একটা কথা হতে পারে যে, কিছু কিছু সব্দ আছে যেগুলো এককভাবে লিখতে বা পড়তে গেলে মানে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। যেমন, সাপ *শাপ*; সব *শব*। এখানে সাপ মানে সর্প, এবঙ *শাপ* মানে অভিসাপ। আবার সব মানে সবকিছু এবঙ *শব* মানে লাস। এসব ক্ষেত্রে যদি মানে বুঝতে অসুবিধাই হয়, তবে কলা, তাল, পদ, দল, ছত্র, হাল, বাসর, বাঁধা, বাগ, বিধি, বর, কর, কদম এই সব্দগুলোর মানে কিভাবে বুঝব? কলা মানে কদলি, সিল্প, চন্দ্রগ্রাসের চিত্র অথবা ছলনা হতে পারে। আবার তাল মানে সুস্বাদু ফল, সঙ্গিত বা নৃত্যের তাল হতে পারে। পদ মানে চরন, কবিতা, পদবি হতে পারে। দল মানে পাপড়ি, জনগোষ্ঠি বা সম্প্রদায় হতে পারে। ছত্র মানে অন্ন বিতরনের স্থান (অন্নছত্র), পঙ্‌ক্তি বা লাইন অথবা ছাতা হতে পারে। হাল মানে লাঙ্গল, নৌকার হাল, অবস্থা অথবা আধুনিক হতে পারে। বাসর মানে বিবাহ রজনি ঘর, দিবস হতে পারে। বাঁধা মানে বন্ধক, দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়ে পারে। বাগ মানে বাগান, সাসন বা বল্গা হতে পারে। বিধি মানে বিধান বা নিয়ম, সৃষ্টিকর্তা বা ইস্বর হতে পারে। বর মানে বিয়ের পাত্র বা স্বামি, দেবতা বা গুরুজন কর্তৃক প্রাপ্ত আসির্বাদ হতে পারে। আবার বিসেষন হিসেবে উত্তম বা স্রেষ্ঠও হতে পারে। যেমন, বন্ধুবর। কর মানে উতপাদক বা নির্মাতা হতে পারে, কিরন বা রস্মি হতে পারে, হাত বা রাজস্ব হতে পারে। কদম মানে একধরনের ফুল, চরন অথবা পদক্ষেপ হতে পারে। তাহলে নির্দিস্ট স না দিলে যে অর্থ বোঝা একেবারেই অসম্ভব এ কথা ধোপে টিকছেনা। এ জটিল সমস্যার সমাধান কেবল পন্ডিতজনেরাই দিতে পারেন। বলতে বা সুনতে কিন্তু স নিয়ে কোন সমস্যা নেই। সুধু লিখতে বা পড়তে গেলেই যত ঝামেলা। মুখে বললে যদি অর্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়, তবে লিখতে বা পড়তে গেলে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যা ভাবলেই সমস্যা। মেনে নিলে কোন সমস্যা নেই। সুধু একটু অভ্যাসের পরিবর্তন করতে পারলেই হল। তাহলে দেখা যাচ্ছে তিনটি স'র পরিবর্তে দুটি স দিয়েও বাঙলা ভাষা চলতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে *শ* বাদ দেয়াই বোধ হয় সহজ। এখানে আর দুটো অক্ষরের কথা বলি, ঋ এবঙ ৯। বিদ্যাসাগর বাঙলা লিপিমালায় এ অক্ষর দুটোকে জুড়ে দিয়েছিলেন অবস্যই কোন প্রয়োজনে। কিন্ত সে প্রয়োজন এখন আর নাই। তাই অক্ষরদুটিও নেই। এছাড়া বাঙলা লিপিমালায় যে দুটো ব আছে তা আমরা ক'জন জানি? আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষের জন্যই ভাষা, ভাষার জন্য মানুষ নয়। যুগে যুগে মানুষ তার প্রয়োজনে ভাষাকে পরিমার্জন বা আধুনিকায়ন করেছে এবঙ ভবিষ্যতেও করবে। এই কাজটি প্রধানত কবি সাহিত্যিক বা লেখকরাই করে এসেছেন। পন্ডিতরা সুধু সক্ত হাতে সুষ্ঠুভাবে ধারন করার কাজেই নিয়োজিত থেকেছেন। এবঙ এই জন্যেই উদ্ভব হয়েছিল ব্যাকরনের। ভাষার জন্যই ব্যাকরন। ব্যাকরনের জন্য ভাষা নয়। সাহিত্য সঙস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক ***নতুন দিগন্ত*** পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতিয় সঙ্খ্যায় (জানুয়ারি-মার্চ ২০০২) সিরাজুল ইসলাম চৌধুরি ***বাংলা বানানে অন্যায় হস্তক্ষেপ*** প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন যে, ইঙরেজি ভাষায় কোন আধুনিকায়ন বা প্রমিতকরন কখনো হয়নি। তারা এটা পছন্দ করে না। কিন্তু বাঙলা ভাষা তো অন্য কোন ভাষার পদাঙ্ক অনুসরন করেনা। অন্য কোন ভাষা যদি তার অজস্র অসঙ্গতি যুগ যুগ ধরে পুষে রাখে, তাই বলে কি বাঙলাকেও পুষে রাখতে হবে? সে কি কখনো আধুনিক হবেনা? বাঙলা ভাষার আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে সুধু দৃষ্টিভঙ্গি আর মানসিকতা পরিবর্তন করাই যথেস্ট। ব্যাকরন আর ধ্বনিতত্ত্বের কঠিন আবর্তে থেকে আধুনিকায়ন সম্ভব নয়। এ জন্য চাই ইচ্ছেসক্তি বা বিপ্লব। এই বিপ্লব না ঘটালে বাঙলা ভাষায় সুদ্ধ আর অসুদ্ধ পাসাপাসি চলতেই থাকবে অনন্তকাল। অথবা প্রতিটি বাঙলা ভাষাভাষিকে ভাষায় পন্ডিত হতে হবে। আর নাহয় সবাইকে একটি করে অভিধান বগলদাবা করে সবসময় চলতে হবে। প্রয়োজনে অভিধান বা ব্যাকরন পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ভাষার আধুনিকায়ন ঠেকানো, বালির বাঁধ দিয়ে খরস্রোতা নদিকে ঠেকিয়ে রাখার মতই বৃথা পন্ডস্রম। এখানে ডঃ মুহম্মদ সহিদুল্লাহ'র একটি

উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন, *নদীর গতিপথ যেমন নির্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষাও তেমনি। একমাত্র কালই ভাষার গতি নির্দেশ করে। ভাষার রীতি (স্টাইল) ও গতি কোন নির্দিষ্ট ধরা বাঁধা নিয়মের অধীন হতে পারে না।* সময়ের প্রয়োজনে ভাষা সকল বাঁধ ভেঙ্গে তার নিজস্ব গতি খুজে নেবেই। এখানে ***দৈনিক জনকণ্ঠ*** -এর একুসে ফেব্রুয়ারি সুবর্ন জয়ন্তি ২০০২ সঙ্খ্যা'র পৃষ্ঠা ১৪ তে মাহবুবুল হক রচিত প্রবন্ধ ***বাংলা বানান সংস্কার ও প্রমিতকরণের অর্ধশতক*** থেকে একটা উদাহরন দেয়া যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, *১৯৩০-এর দশকে বাংলা বানানের নিয়ম প্রণয়নে উদ্যোগী ভূমিকা রাখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানবিধি প্রণয়নে এগিয়ে আসেন। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োজিত বানান সমিতির সুপারিশ হিসেবে বাংলা বানানের নিয়ম প্রকাশিত হয় ১৯৩৬-৩৭ সালে। রক্ষণশীল কিছু পন্ডিত এর বিরোধিতা করেছিলেন। তবে রবিন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মত জনপ্রিয় লেখক ঐ নিয়ম অনুসরন করে বানান লিখতে সম্মত হলে ঐ নিয়ম চালু করার অনুকুল পরিবেশ তৈরী হয়। ১৯৩৭ এর পরে প্রকাশিত সব অভিধানে ঐ বানান বিধি গৃহীত হওয়ায় বানানে মোটামুটি শৃঙ্খলা আসতে থাকে।* রবিন্দ্রনাথ ও সরৎচন্দ্র উভয়ই ছিলেন মুলত সাহিত্যিক। ভাষাবিদ হিসেবে তাঁদের আমরা প্রথমেই চিহ্নিত করি না। তখন কিন্তু অনেক বড় বড় ভাষাবিদ বা পন্ডিত ছিলেন, যাদের নাম এবঙ অবদান আমেরা আরো বহুদিন স্রদ্ধার সাথে স্মরন করব। কাজটি কিন্তু তাঁরাও করতে পারতেন। কিন্তু পারেননি। পেরেছেন কবি সাহিত্যিকরাই। কবি সাহিত্যিকদের কোন সিমাবদ্ধতা নেই। তাদের কলম মুক্ত। তাদের ভাবনা অবারিত। মুক্ত চিন্তা ছাড়া সুধু ভাষাই না, কোন কিছুরই প্রসার ঘটেনা। এগিয়ে যেতে হলে খাঁচা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতেই হবে। আর এজন্যে মস্তিষ্কের চর্চার পাসাপাসি হৃদয়ের চর্চারও প্রয়োজন।

আমার এই মতামত বাস্তবায়িত করার জন্য আমি আমার লেখায় ঈ ঊ ণ শ ং এই পাঁচটি অক্ষর আর ব্যবহার করছিনা।

১৮.৩.২০০২
কল্যানপুর, ঢাকা

তোমার আমার বাঙলা বানান

সৈসব থেকেই একটা চেতনা আমাকে নাড়া দিয়ে আসছে। চেতনাটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাথাচাড়া দেয়। প্রকাস পেতে চায়। প্রকাস করতে গিয়ে ছোটবেলায় হাতে তুলে নিয়েছিলাম রঙ-তুলি। মনে আছে, বেস প্রসঙসা পেয়েছিলাম। কিন্তু ধরে রাখতে পারলাম না। যৌবনে এসে নাটক পাগল হলাম। সুধু মঞ্চাভিনয়ই নয়, পাসাপাসি আবৃত্তি। সুধু প্রসঙসা আর হাততালিই নয়, অনেকগুলো পুরস্কারও জুটে গেল। দৃষ্টি পড়ল সিনেমার পর্দায়। পড়াসুনায় ভাটা পড়ল। সিনেমাতে অভিনয় করাই মনে হল জিবনের একমাত্র কাজ। কিন্তু না। কিছুদিনের ভিতর বুঝতে পারলাম, সিনেমাতে অভিনয় করাটা আসলে কিছুনা। আমার চেতনাগুলোকে প্রকাস করতে হলে সিনেমাকে হাতিয়ার হিসেবে নিতে হবে। কারন সিনেমাই হচ্ছে সিল্প সৃষ্টির সর্বস্রেষ্ঠ মাধ্যম। কিছুদিন প্রসিক্ষনের পর নিজেই সিনেমা পরিচালনার কথা ভাবোলাম। লিখে ফেললাম চিত্রনাট্য। কিন্তু তারপর আর হলনা। পড়ে রইল আমার চিত্রনাট্য।

অনেক ক'টা বছর পেরিয়ে গেল। ধুলো জমতে থাকল আমার চিত্রনাট্যের পাতায়। কিন্তু মাথার ভিতর থেকে পোকাটা তাড়াতে পারলাম না। বারবার আমার চেতনাগুলোকে দাবড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলো ওই পোকাটা। এখন কি করি? ভাবতে ভাবতে ছোটদের জন্য লিখে ফেললাম রুপকথার ছলে একটা ছোট বই ***কেমন করে স্বাধিন হলাম***। তারপর একদিন মনে হল, আমার সেই চিত্রনাট্যটাকে উপন্যাসে রুপ দিলে কেমন হয়। কিন্তু উপন্যাস! সে তো আরেক জগত। কিছু কিছু উপন্যাস মনযোগ দিয়ে পড়া সুরু করলাম। তারপর একসময়ম চিত্রনাট্যটার ধুলো ঝেড়ে মুছে, ওটাকে উপন্যাসের মত করে লিখতে বসলাম। কিন্তু প্রথমেই হোচট খেলাম বাঙলা বানান নিয়ে। এতো এক মহা ফ্যাসাদ। বাঙলা সাহিত্যের নন্দিত সব কথা সাহিত্যিক, তাঁদের লেখার ভিতর খুজে পেলাম বানানের বিভিন্ন অমিল। এখন কি করি? বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম স্রেষ্ঠ কবি সামসুর রাহমান *সাদা* লিখেছেন *শ* দিয়ে *শাদা*। সৈয়দ সামসুল হক লিখেছেন *শ* দিয়ে *শাদা* তার কবিতায়। ডঃ হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন *শ* দিয়ে *শাদা* তার ***আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম*** বইটিতে। আরো পেয়েছি। যেমন, দারুন একটুই উপন্যাস ***উড়ুক্কু***। ঔপন্যাসিক নাসরিন জাহান তার উপন্যাসটিতেও লিখেছেন *শ* দিয়ে *শাদা*। অভিধানে পাচ্ছি স দিয়ে সাদা। আমি কি লিখব? অভিধান মানবো, নাকি কবি সামসুর রাহমান। তারপর এল *জরুরি* সব্দটি। এটা লিখতে গিয়ে ই-কার, *ঈ*-কার উভয়ই ব্যবহৃত হচ্ছে। বাড়ি, গাড়ি, পাখি এগুলোর ক্ষেত্রেতো ই-কার না *ঈ*-কার হবে তা নিয়ে কারো কোন মাথা ব্যথা নেই। ফ্রি স্টাইলে চলছে। *সরকারি* সব্দটির বানান লিখতে সরকার নিজেই বোধহয় দ্বিধাগ্রস্ত। *ভুল* সব্দটি লিখতে গিয়ে হয়তোবা আমাদের জিবনভর ভুল আর সুদ্ধ পাসাপাসি চলতেই থাকবে। উ-কার দিয়ে লিখলে বোধহয় ছোট ভুল আর ঊ-কার দিয়ে লিখলে হয়তোবা বড় ভুল। ণ এর ক্ষেত্রেতো কোন কথাই নেই। ন ণ একটা হলেই হল। মাঝে মাঝে মনে হয় ন যদি দুটো থাকতে পারে তাহলে ম কেন দুটো হল না। ং এর ব্যবহার বড় বিচিত্র বলে মনে হয়। *রং ঢং* এগুলো লিখতে গিয়ে ং ব্যবহার করছি, আর যখনই রঙের বা ঢঙের লিখছি তখন ডাক পড়ছে ঙ এর। সেদিন চোখে পড়লো বৈসাখি বানান। ১৬ এপ্রিল, ২০০৩ তারিখের ***দৈনিক ইত্তেফাক*** লিখেছে , *কালবৈশাখী।। রাজধানীতে দেয়াল ধসে শিশুসহ ৪ জনের মৃত্যু ।* একই দিন প্রথম আলো লিখছে, *কালবৈশাখিতে প্রাচীর ভেঙে ২ বোনসহ ৪ জনের মৃত্যু*। আমি এখন কি করব? বৈসাখি বানানটিতো আমাকেও লিখতে হবে। আমি কি ই-কার দেব, নাকি *ঈ*-কার দেব। অভিধান খুলে দেখি *ঈ*-কার দেয়া আছে। কিন্তু ***প্রথম আলো*** দেসের একটি প্রধান পত্রিকা। তার কথাও ফেলে দেই কিভাবে। ভাবলাম বৈসাখি লিখতে যদি ই-কার দেয়া হল, তবে প্রাচির বানানে কেনই বা *ঈ*-কার রয়ে গেল? এমনি উদাহরনের সেষ নেই। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে বাঙলা বা বাঙালি সব্দটি আমরা চার এবঙ ছয় রকম লিখছি। যেমন বাংলা, বাঙলা, বাঙ্গলা, বাঙ্গালা আবার বাংগালি, বাংগালী, বাঙালি, বাঙালী, বাঙ্গালি, বাঙ্গালী। হয়তোবা সবগুলোই সুদ্ধ। কিন্তু তাই বলে কি একটা ঠিক করে নেয়া যায় না? এবঙ তাহলেই কি বাঙালির পারস্পরিক একাত্মতা, অন্তত ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে দৃঢ় হয়না? এখানে

একটা উদাহরন দেই। বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল সুনিল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ***পূর্ব-পশ্চিম*** উপন্যাসটির ৩৪৬ পৃষ্ঠার এক জায়গায় লিখেছেন, ...*বাঙ্গালী শুধু পলিটিক্স আর মাস্টারি করতেই জানে। .....এখন ব্যবসায় ঝাপিয়ে পড়াই হবে তোর আমার মতন বাঙালীর বেস্ট পলিটিক্স।* একই উপন্যাসের ৩৬৪ পৃষ্ঠায় আবার তিনি লিখছেন, ... *আমি ভাগলপুরের বাংগালীদের ইস্কুলে কিছুদিন পড়ালিখা করেছিলাম।* এখানে একই লেখকের লেখাতেই পাচ্ছি তিন রকম বানান।

বাঙালি সব্দটির আরো কয়েকটি উদাহরন দেয়া যাক। হায়াৎ মামুদের লেখা একটি বই ***বাঙালির বাংলা ভাষা ইদানীং*** । আব্দুল্লাহ আবু সায়িদ রচিত একটি বই, ***সংগঠন ও বাঙালি*** । মইনুদ্দিন খালেদ তার একটি বইয়ের নাম রেখেছেন এভাবে, ***দশ বাঙালি শিল্পী*** । এবার ***প্রথম আলো*** থেকে উদাহরন। ৬ জুন ২০০৩ সুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকিতে ২১ ও ২২ পৃষ্ঠা জুড়ে ***অমর একুশে বইমেলা ২০০৩ এর নির্বাচিত ১০ মননশীল বই*** সিরোনামে বিসাল আলোচনা ছাপা হয়েছে। এখানে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকি, এ জেড এম আবদুল আলি, সৈয়দ আবুল মকসুদ, আবুল মোমেন, মফিদুল হক, সফি আহমেদ, মাসুদুজ্জামান, আহমদ মাযহার, মারুফ রায়হান ও আমিনুল এহসান। দসটি বই নিয়ে দসটি আলোচনায় আমার চোখে ছাব্বিস বার *বাঙালি* সব্দটি ধরা পড়েছে এবঙ ছাব্বিস বারই বানানটি লেখা হয়েছে, *বাঙালি* এভাবে। এছাড়া *সরকারি, একাডেমি, ফেব্রুয়ারি, জরুরি*, সব্দগুলো লিখতে ই-কার ব্যবহার করা হয়েছে। ৩০ মে ২০০৩ তারিখের ***প্রথম আলো*** পত্রিকায় মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ***বাঙালির ভাব-ভাষার দৈন্য*** সির্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তার লেখায় *বাঙালি* সব্দটি তিনি লিখেছেন এভাবে *বাঙালি* । আবার একাডেমি লিখেছেন ঈ-কার দিয়ে।

কবি সামসুর রাহমানের একটি বিখ্যাত লেখা ***কালের ধুলোয় লেখা***, ***দৈনিক জনকণ্ঠ***-এ আমরা অনেকেই পড়েছি। তার এই লেখায় *বাঙালি* সব্দটি দুই ভাবেই এসেছে। *বাঙালি* এবঙ *বাঙালী* । এটা ছাপার ভুলও হতে পারে। উদাহরন-১৬ আগস্ট ২০০২ এবঙ ২৩ আগস্ট ২০০২ এর ***দৈনিক জনকণ্ঠ*** । ছাপার ভুল হোক আর যাই হোক আমাদের কারও কিন্তু তাতে মানে বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি।

৭ সেপ্টেম্বর ২০০২ সালে জাতিয় প্রেস ক্লাবে ***বাঙালি সমগ্র*** সঙগঠন আয়োজিত এক সঙবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কবি সামসুর রাহমান এবঙ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। ওই সম্মেলনের ব্যানারে দুইবার বাঙালি সব্দটি লেখা হয়েছে এভাবে, *বাঙালি* । প্রমান- ৯ সেপ্টেম্বর, ২০০২ এর ***দৈনিক জনকণ্ঠ*** ।

অভয় বাজে হৃদয় মাঝে, ওয়াহিদুল হকের একটি বিখ্যাত কলাম। বিখ্যাত ওই পত্রিকার একটি সঙ্খ্যায় তার কলামের সিরোনাম এসেছে এভাবে, ***জাগো বাঙ্গালী জাগো*** । ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখের ***দৈনিক জনকণ্ঠ*** সাময়িকিতে ইসরাইল খানের একটি লেখা প্রকাসিত হয়েছে, ***বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের অবদান***, এই সিরোনামে। লেখাটিতে আবদুল করিম সাহিত্য বিসারদের কিছু উদ্ধৃতিসহ লেখকের কিছু বানান উল্লেখ করা যেতে পারে। বানানগুলো এসেছে এভাবে , বাঙালী, *বাঙালি, বাঙালা, বাঙলা, বাঙ্গালা, বাংলা।*

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরি ***নতুন দিগন্ত*** নামে একটি চমতকার সাহিত্য সঙস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক সম্পাদনা করে থাকেন। জানুয়ারি-মার্চ, ২০০২ এ প্রকাসিত ওই ত্রৈমাসিকের প্রথম বর্ষ দ্বিতিয় সঙ্খ্যায় ***বাংলা বানানে অন্যায় হস্তক্ষেপ*** নামে তার লেখা একটি মুল্যবান প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। ওই প্রবন্ধ থেকে প্রাসঙ্গিক দু-একটি কথা এখানে বলা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, ... *বাঙালী সব সময়ই ী যুক্ত ছিল। ও ভাবে এতকাল লিখে এসেছি, আমার বাবা লিখেছেন, তাঁর বাবাও লিখেছেন। ওই বানান ইতিহাস নয় কেবল, আমাদের ঐতিহ্যও । .....* তার এই কথা মানতে হলে ইতহাস রক্ষা করতে আমাদের ফিরে যেতে হয় চর্যা পদের ভাষায় । কাম্বুপাদ বা কুক্কুরি পাদের ভাষায়। বিদ্যাসাগরের আদর্স লিপিতে

আমার বাবা, দাদা ৯ আর ঁ দুটি অক্ষর সিখে এসেছেন। ঐতিহ্য রক্ষা করতে কি আমরা অক্ষর দুটি আবার ব্যবহার করা সুরু করব। ৯ দিয়ে লিখব *৯চু* ? নাকি বেত্রাঘাতে কোমলমতি সিসুদের সাধু ভাষায় ফিরে যেতে বাধ্য করব? তিনি লিখেছেন, *বাঙালী কে বাঙালি বানানে যতবার দেখি ততবারই মনে হয় ী -কারকে হ্রস্ব করে বাঙালীকেই খাটো করা হচ্ছে, সে হ্রস্ব হচ্ছে।* ি -কার দিয়ে বাঙালি লিখলে বাঙালি খাটো হয়ে যাবে, হ্রস্ব হয়ে যাবে। আর *ী* -কার ব্যবহার করলেই বাঙালি বুক টান করে দাড়িয়ে যাবে। এ সঙ্গার ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। বাঙালি কখনই খাটো বা হ্রস্ব নয়। বাঙালিকে খাটো বা হ্রস্ব ভাবা একধরনের হিনমন্যতারই বহিঃপ্রকাস।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন, *কিন্তু আমি না মানলে কি হবে, পত্রিকার সম্পাদক, কম্পিউটার কর্মী, প্রুফ সংশোধক সকলেই মেনে নিয়েছেন। বাঙালী বানান যতবার বাঙালী লিখি ততবারই দেখি সংশোধিত হয়ে গেছি।* তাঁর এই কথায় প্রমান হয় যে সময়ের সাথে সাথে ভাষাও সামনে এগিয়ে চলে। তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সব কম্পিউটার কর্মি বা প্রুফ সঙসোধককে কি ব্যাকরন বিসারদ বানানো সম্ভব হবে?

তিনি রবিন্দ্রনাথের বানানে *ী* কারের স্থলে ি-কার স্থাপনের আসঙ্কা প্রকাস করেছেন। *রবি+ইন্দ্র = রবীন্দ্র* । সন্ধি বিচ্ছেদ সঠিক। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যার পক্ষে এ সন্ধি বিচ্ছেদ মনে রাখা সম্ভব হলনা, তিনি কি রবিন্দ্র সব্দটি কোথাও লিখবেন না। অথবা তিনি কি কম্পিউটার কর্মি বা প্রুফ সঙসোধক হবার অধিকার হারাবেন? অজ্ঞতাবসত হোক অথবা প্রুফ দেখার ভুলই হোক, ি-কার দিয়ে *রবিন্দ্রনাথ* লিখলে মানে বোঝার কোন সমস্যা হবার কথা নয়। বাঙলা ভাষায় কি একই নাম একাধিক ব্যক্তির থাকে না? *ী*-কার না থাকলে চন্ডিদাস নিয়েও সমস্যা হতনা।

আমার কাছে মনে হয়েছে বাঙলা, বাঙালি আর বাঙলাদেস এই তিনটি সব্দের বানানে মিল থাকাই বাঞ্ছনিয়। সে ক্ষেত্রে বাঙলাদেস লিখতে গিয়ে ঙ ব্যবহার করতে কোন বাধা নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লেখা হচ্ছেও। যেমন, হুমায়ুন আজাদ তার একটি বইয়ের সিরোনাম লিখেছেন এভাবে, ***আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম*** । সুনিল গঙ্গোপাধ্যায় তার ***পূর্ব-পশ্চিম*** উপন্যাসের ৪৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন *.....তারা আলোচনা করছে বাঙলাদেশ নিয়ে।*

আমার দৃষ্টি কাড়লো মোট পাচঁটি অক্ষরের উপর। এগুলো হচ্ছে ঈ, ঊ, ণ ং, শ। এই অক্ষরগুলো ব্যবহার করতে গিয়েই যত বিপত্তি। এখন আমি কি করব? একবার মনে হল অভিধান মানাইতো উচিত। কারন, অসুদ্ধ বানান কারো জন্য কাম্য নয়। আবার অভিধান মানতে গিয়ে মনে হল সময়ের স্রোতের কাছে পিছিয়ে পড়তে হবে। মনে হল, বাঙলা ভাষা ধির গতিতে হলেও নিরবে, অজান্তে আধুনিকায়নের পথে যাচ্ছে। যারা বিভিন্ন রকম বানান লিখছেন তাদের ভিতর রয়েছেন গুনিজন। আবার রয়েছে দেসের নামকরা সব পত্র পত্রিকা । তবে অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞতাবসতও হয়ে চলেছে। তবে যে ভাবেই হোক, কাজ কিন্তু থেমে নেই। চলছেই। কেউ বানান নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামাচ্ছেনা। এমন একটা ভাব, বানানে কি এসে যায়, কাজ চললেই হল।

আমার কাছে মনে হল, প্রতিটি বাঙালির ভাষাই বাঙলা। সবাই বাঙলায় কথা বলে, সোনে, লেখে, পড়ে। নিরক্ষর লোকের কথা না হয় বাদই দিলাম। সিক্ষিত সমাজের কথা ভেবেই কথা বলা যাক। আমরা যখন কথা বলি বা সুনি, তখন কিন্তু আমরা কেউ বানান নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছিনা। বাঙলা লেখা কোনকিছু কেউ পড়ে সোনালে বা রেডিও টিভিতে বাঙলা খবর সোনার সময় কাগজের পাতায় কি বানান লেখা আছে তার খবর জানার কোন প্রয়োজন পড়ে না। অথচ যা বলা হচ্ছে বা সুনছি তাও বাঙলা। মানে বুঝতে কারো কোন অসুবিধা হচ্ছে না। তা হলে বানান সমস্যা সুধু মাত্র লেখা বা পড়ার সময়ই ধরা পড়ছে। তাও আবার লিখতে গিয়ে যতটা, পড়তে গিয়ে ততটা না। তবে ধরা পড়ছে কাদের কাছে? যারা বানান সম্পর্কে সচেতন। গুনিজন । পন্ডিত। তারাই ভুলটা ধরতে পারছেন। আমাদের মতন সাধারন মানুষ বানান ভুল নিয়ে মোটেই মাথা

ঘামাচ্ছে না। তা হোকনা অজ্ঞতাবসত। দেসের প্রতিটি মানুষই সুসিক্ষিত হবে বা সবাইকে বানান সচেতন হতে হবে, তা কি আসা করা যায়? তাই বলে কাজ কিন্তু থেমে নেই।

আগেই বলেছি নিরক্ষর লোকের কথা বাদ রাখছি। কারন বানান সমস্যা সুধু মাত্র সিক্ষিতদের জন্যে। তা সঙ্খ্যায় কারা বেসি? অর্থাত, বাঙলা ভাষা লেখা পড়ায় ব্যবহার করছি এমন মানুষের মধ্যে কাদের সঙ্খ্যা কত? আলোচনার সুবিধার জন্যে সাদামাটা ভাবে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। ১) পন্ডিত বা গুনিজন ২) সাধারন সিক্ষিত ৩)অল্প সিক্ষিত । চুলচেরা পরিসঙ্খ্যানে না গিয়ে মোটামুটি ভাবে বলা যায়, বাঙলা ভাষায় পন্ডিত বা গুনিজন অত্যন্ত সচেতনভাবে ভাষার চর্চা করে থাকেন। তাঁরা চান সবাই বানানের প্রতি সচেতন থাকুন। তাঁদের এই চাওয়া অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তাদের থেকে সঙ্খ্যায় বেসি সাধারন সিক্ষিত মানুষ , যারা অফিস-আদালত, ব্যবসা-বানিজ্য বা অন্যান্য ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষা লেখা পড়ায় ব্যবহার করেন। তারা কি সুদ্ধভাবে বানান চর্চা করছেন বা করতে পারছেন? তারা কি *সরকারি* সব্দে একবার ই-কার আরেকবার *ঈ*-কার ব্যবহার করছেননা? তারা কি *কারন* বা *করুন* লিখতে গিয়ে দু'টি ন নিয়ে তালগোল পাকাচ্ছেন না। সরকারি সঙস্থার গাড়িতে *জরুরি* বানান *ঈ*-কার দিয়ে লেখা হলেও দেসের নামকরা পত্রিকাতে ই-কার ব্যবহার করা হচ্ছেই বা কেন? বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞপ্তি বা গাড়ি কেনা বেচার বিজ্ঞপ্তি দেখলে একথা বিস্বাস করতেই হবে যে , বহুদিন আগে রবিন্দ্রনাথ বাড়ি, গাড়ি আর পাখি বানানে ই-কার ব্যবহার করে গেলেও আজও আমরা এই তিনটি বানান কিভাবে লিখব তা ঠিক করতে পারলাম না। স্কুল কলেজের কথাই বা একেবারে বাদ দেব কেন? সিক্ষকরা কি সব ক্ষেত্রে নির্ভুল বানান সিক্ষার্থিদের সেখাতে পেরেছেন? সিক্ষার্থিরা কি পরিক্ষার খাতায় নির্ভুল ভাবে বাঙলা লিখতে পারছে? তবুও ওরা পাস করছে। বড় বড় অফিস আদালতের দায়িত্ব নিচ্ছে। তবুও অফিস-আদালত আর ব্যবসা-বানিজ্য চলছে। এবার অল্প সিক্ষিত মানুষের কথায় আসা যাক। ধরা যাক অল্প সিক্ষিত মানুষ জব্বর মিয়া। তিনি ঢাকা সহরে কাজ করেন। নববধুর কাছে চিঠি লিখতে গিয়ে লিখছেন, *প্রীয় বাসন্তি, প্রিতী নিও। ইদের ছুটিতে বাড়ী যাবার সময় তোমার লাল সাড়ি আর শাদা পেটিকোট ণিয়ে যাব।* উত্তরে নববধু বাসন্তি লিখছে, *ওগো আমার প্রাণপ্রীয় শ্বামি, জিবণে আমি সুধু তোমাকেই চাই। আমি তোমাকে সব সময় স্মরন করি। সাড়ি নিল রংয়ের হলেও হবে। ঈতি তোমারই প্রেয়সি বাসন্তি।* জব্বর মিয়া বা বাসন্তির চিঠির বানান দেখে আমরা হয়তোবা হাসবো। কিন্তু চিঠির মাধ্যমে তাদের যে মনের আবেগ বা ভালবাসার বহিঃপ্রকাস ঘটেছে, তাকে ছোট করে দেখার বোধ হয় কোন অবকাস নেই। সুদ্ধ বানান না জানার কারনে সুসিক্ষিত সমাজ বিদ্রুপ বা কটাক্ষ করলেও তাদের পত্র বিনিময় কিন্তু চলবেই।

এখন কি করব? সাধারন সিক্ষিতকে বানান সেখাবার স্কুল খুলব, নাকি অল্প সিক্ষিতদের চিঠি লেখা নিসিদ্ধ করব। এইসব চুপচাপ হা করে দেখতে থাকব আর মুখে বলতে থাকব আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি অথবা আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুসে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি। কিন্তু আমি তো একজন সাধারন মানুষ। কোন পন্ডিত বা ভাষাবিদ নই। নই দেসের কোন একনামে চেনা মানুষ। আমার কথা কে সুনবে। একবার মনে হল, দুর ছাই, যে যেমন ইচ্ছে লিখুকগে, আমার কি? আমি প্রচলিত যে বানান চলছে, গুনিজন যেভাবে লিখে আসছেন, তাই লিখব। কিন্তু পারলাম না। বারে বারে মনের ভিতর একটা খচখচানি রয়েই গেল। বানানের এই গরমিল দেখে নিজের কাছেই একটা অপরাধবোধ সবসময় ঘুরাপাক খেতে লাগলো। নিজের মনের সাথে আপোষ করতে পারলাম না। মনে হলো এটাতো পুরো জাতির জন্যই একটা লজ্জা। ভাষাতো সুধু একটি জাতির গুটিকয়েক সুসিক্ষিত গুনিজনের জন্যেই নয়। ভাষা সমগ্র জাতির আপামর মানুষের জন্য। যারা নিরক্ষর, তাদের জন্যে ভাষা সুধু বলা ও সোনার। কিন্তু যারা অল্প সিক্ষিত, তাদের ভাষা চর্চার অধিকার থেকে বঞ্চিত করাও যাবেনা। তাহলে বানান ভুলের এই মহামারি থেকে বাঁচার উপায় কি? যদি সত্যি সত্যি বাঙলা ভাষাকে এ দেসের প্রতিটি মানুষের প্রানের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তাহলে বানান সমস্যা কাটিয়ে উঠতেই হবে। হয় প্রতিটি বাঙলা ভাষাভাষিকে সুদ্ধ বানান সেখাবার পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে, নইলে সহজ সরল পদ্ধতি সাধারন মানুষকে উপহার দিতে হবে। সুদ্ধ বানান এবঙ ভুল বানানের এই একত্রে বসবাস জাতির জন্য লজ্জাজনক।

রাতারাতি প্রতিটি সাধারন সিক্ষিত বা অল্প সিক্ষিত বাঙলা ভাষাভাষিকে সুদ্ধ বানান সেখানোর কোন পদ্ধতি আছে কিনা আমার জানা নেই। সেই চেষ্টা করতে গেলে অনেকটা হাতির চাষের মতই অবস্থা দাড়াবে। একদিকে লাঙ্গল চলবে আর অন্যদিকে হাতির পা'র চাপে মাটি সমান হতেই থাকবে। কারন অল্প সিক্ষিত বা বাচ্চাদের সিক্ষাদানে নিয়োজিত সিক্ষকরা কি সবাই সুদ্ধ বানানে পারদর্সি। তারপর রয়েছে দেসকে নিরক্ষর মুক্ত করার মহাপরিকল্পনা। সে ক্ষেত্রে অগনিত বানান সচেতন সিক্ষকই বা কোথায় পাওয়া যাবে? বইয়ে সঠিক বানান থাকা সত্বেও সাধারন সিক্ষিত বা অল্প সিক্ষিতরা যখন সঠিক বানান সিখতে পারলনা তখন নিরক্ষরদের কাছে কি তা আসা করা ঠিক হবে? অথবা আর একটা কাজ করা যেতে পারে, কঠিন আইন করে দেয়া যেতে পারে যে, বানান ভুল হলেই জেল-জরিমানা। কিন্তু তাতে আবার পুলিসের প্যাদানি খাওয়া বা পুলিসকে দক্ষিনা দেবার ভয়ে বানান সেখার প্রবনতা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভবনা থাকে। আর নাহয় আলাউদ্দিনের চ্যারাগ একটা পাওয়া গেলে দৈত্যকে পুরো দেসের বাঙলা বানান সুদ্ধ করার কাজে লাগিয়ে দেয়া যায়। সেই চেরাগও পাবার কোন সম্ভবনা নেই।

আগেই বলেছি সাধারনত বাঙলা বানান ভুল হয়ে থাকে *ঈ,ঊ,ণ,শ,ং* এই পাঁচটি অক্ষরের জন্যে। *ঈ,ঊ,ণ* যতদিন জিবিত থাকবে ততদিন বানান ভুল থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। তাছাড়া *শ* এবং *ং* এর বদলে স আর ঙ দিয়ে যখন দিব্যি কাজ চালানো যায়, তখন ওদুটো বোঝাকে ধরে রেখে ঝামেলা বাড়িয়ে আর লাভ কি। তাহলে বাঙলা ভাষা সহজ ও সরল ভাবে লিখতে পড়তে আর বানান ভুলের হাত থেকে বাঁচতে এই পাঁচটি অক্ষর বাদ দেয়াইতো ভাল। ধুলো থেকে পা বাঁচাতে পুরো দেসের ধুলো ঝেটিয়ে বিদেয় করতে গিয়ে মহা বিপত্তি ঘটানোর চেয়ে মুচির পরামর্স মত জুতো দিয়ে পা মুড়িয়ে নেয়াইতো বুদ্ধিমানের কাজ। বলতে আর সুনতে যদি বানান কোন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তবে লিখতে বা পড়তে কেন সমস্যা হবে। বাঙলা ভাষায় এমন বহু সব্দ আছে যার বানান এক, কিন্তু মানে একাধিক। যেমন, ময়না মানে ময়না পাখি হতে পারে, আবার ময়না তদন্তও হতে পারে। দান মানে পাত্র হতে পারে, আবার দান করাও হতে পারে। ছিপ মানে নৌকো হতে পারে, আবার মাছ ধরার ছিপও হতে পারে। তুলা মানে কার্পাস বা সিমুল তুলা হতে পারে, আবার দাড়ি পাল্লাও হতে পারে। তাহলে *ঈ* এর বদলে ই, *ঊ* এর বদলে উ, *ণ* এর বদলে ন, *শ* এর বদলে স আর *ং* এর বদলে ঙ দিয়ে লিখলে মানে বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। তাছাড়া উচ্চারনের বেলায় স বা *শ*'র উচ্চারন যদি কোন সময় ছ'র মত হতে পারে তবে ই'র উচ্চারন *ঈ*'র মত আর উ'র ইউচ্চারন *ঊ*'র মত হতে দোষ কোথায়। তবে স'র উচ্চারন ছ'র মত হওয়া বাঞ্ছনিয় নয়। কারন ছ উচ্চারনের জন্য ছ'তো আছেই। স'র উচ্চারন যদি ছ'র মত করতে হয়, তবে সোনা উচ্চারন কি হবে ছোনা? সাহিত্য উচ্চারন কি হবে ছাহিত্য? সমুদ্র উচ্চারন কি হবে ছমুদ্র? সাত উচ্চারন কি হবে ছাত? বিলাস উচ্চারন কি হবে বিলাছ? বাতাস উচ্চারন কি হবে বাতাছ? সঙ্গ্রাম উচ্চারন কি হবে ছঙ্গ্রাম? সঙবাদ উচ্চারন কি হবে ছঙবাদ? সৌরভ উচ্চারন কি হবে ছৌরভ? এমনিভাবে স দিয়ে প্রায় সব বাঙলা সব্দের উচ্চারনই স'র মতই হয়। পক্ষান্তরে কিছু বিদেসি সব্দ যা বিদেসি ভাষা থকে এলেও এখন সেগুলোও বাঙলা সব্দ। যেমন, সিন, সিনেমা, সিপাই, সিভিল, সিমেন্ট, সিল্ক, সিট, সিল ইত্যাদি। এ সব্দগুলোতে স ব্যবহারের পিছনে নিস্চই যুক্তি রয়েছে। কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে স'র বদলে ছ ব্যবহার করলে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। এতে বানানের জটিলতা অনেক কেটে যাবে। এরপর *ণ*'র কথা। *ণ*'র বদলে ন ব্যবহারে একেবারেই সমস্যা নেই। এই অক্ষরটি যে এতকাল টিকে আছে কিভাবে, ভাবলে অবাক হতে হয়। সমস্যা ভাবলেই সমস্যা। মেনে নিলে সব ঠিক। একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওই পাঁচটি অক্ষরের কারনে যে সমস্ত সব্দ যিনি ভুল বলে মনে করেন, তিনি কিন্তু সব্দটির মানে প্রথমেই বুঝে নিয়েছেন, পরে বানানের ভুল ধরেছেন। মানে বুঝতে না পারলে ভুল ধরলেন কিভাবে? তাই সাধারন মানুষকে স্বস্তি দিতে, প্রতিটি বাঙলা ভাষাভাষির কাছে সহজ সরল ও নির্ভুল বানান উপহার দিতে *ঈ,ঊ,ণ,ং,শ* এই পাঁচটি অক্ষর বাদ দিয়ে বাঙলা ভাষা চর্চা করাই তো ভাল। অনেকে আমাকে বলেছেন, এ কাজটি করতে গেলে সমস্যা বাড়বে। যেমন আছে তেমনি থাক। তাহলে এখন যেমন চলছে তাতে কি কোন সমস্যা নেই? যদি সমস্যা না মনে করি তাহলে কথাটা কি অনেকটা স্বার্থপরের মত হয়ে গেলনা? অর্থাত যারা উচ্চসিক্ষিত তারাই নির্ভুল বানান চর্চা করবেন, আর যারা সাধারন সিক্ষিত বা অল্প সিক্ষিত তারা ভুল লিখলো কি ঠিক লিখলো তাতে কার কি আসে যায়। তারা

উচ্চসিক্ষিত হলেইতো পারে। তাহলে সবাইকে হয় বাঙলায় পন্ডিত বা ভাষাবিদ হতে হবে নতুবা বাঙলা অভিধান একটা বোগলদাবা করে চলাফেরা করতে হবে।

ভাষা চিরদিন এক রকম থাকেনি। যুগে যুগে আধুনিকায়ন হয়েই চলেছে। ভবিষ্যতেও হবে। জিবনের সব ক্ষেত্রে যদি আধুনিকায়ন হতে পারে, তবে ভাষার ক্ষেত্রে কেন নয়? আধুনিকায়ন ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মানুষের জন্যেই ভাষা, ভাষার জন্যে মানুষ নয়। ভাষার জন্যেই ব্যাকরন। ব্যাকরনের জন্যে ভাষা নয়। ভাষার আধুনিকায়ন কিন্তু ব্যাকরন বা ধ্বনিতত্ত্ব অনুসরন করে কখনো সম্ভব হয়নি বা হবেওনা। ব্যাকরন বা ধ্বনিতত্ত্ব প্রচলিত ভাষাকে সঠিক ভাবে ব্যবহারের দিক নির্দেসনাই দিয়ে থাকে। সক্ত হাতে অনেকটা রেফারির ভুমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু খেলার নিয়ম পরিবর্তন বা আধুনিকায়ন করা হলে রেফারিকে নতুন নিয়ম মেনেই চলতে হয়। নতুবা সেই রেফারিকে বিদায় নিতে হয়। পুরনো নিয়ম আকড়ে ধরে আধুনিকায়ন হয়না। এই পরিবর্তন বা আধুনিকায়ন সময়ের প্রয়োজনেই হয়ে থাকে। ব্যাকরন বা ধ্বনিতত্ত্বকে আকড়ে ধরে কিন্তু ভাষার আধুনিকায়ন সম্ভব নয়। তাই বলে ব্যাকরন, ধ্বনিতত্ত্ব বা অভিধান যে ভুল, তা কিন্তু মোটেই নয়। সেই হ্যালহেড সাহেবের পর রামমোহন রায়ই প্রথম বাঙালি যিনি বাঙলা ব্যাকরন লিখেছিলেন। তবে ওই ব্যাকরন ছিল ইঙরেজি আর সঙস্কৃত ব্যাকরনের আদলে। তবে আজ পর্যন্ত বাঙলা ব্যাকরন বিসারদ বা ভাষাবিদরা খুব যত্নের সাথে, অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ভাবেই ব্যাকরন বা ধ্বনিতত্ত্ব প্রনয়ন করেছেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওই ব্যাকরন বা ধ্বনিতত্ত্ব প্রতিটি বাঙলা ভাষাভাষির পক্ষে পুরোটা মেনে চলা সম্ভব হচ্ছেনা। অথবা একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, বাঙলা ব্যাকরন প্রতিটি বাঙলা ভাষাভাষির প্রয়োজন থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে অনেকটা দুরে সরে আছে। অভিধানের সাহায্য নিতে গেলেও অনেক সময় পুরোটা সমাধান পাওয়া যায়না। যেমন অভিধানে গাড়ি,বাড়ি,পাখি বা সরকারি সব্দগুলোতে ই-কার আর ঈ-কার দুটোই সঠিক বলে দেখানো হয়েছে। অভিধান কিন্তু এখানে সততার পরিচয়ই দিয়েছে। কিন্তু আমাদের মত সাধারন মানুষের জন্য প্রস্ন থেকেই যাচ্ছে, যা একটা সমৃদ্ধ ভাষার জন্য সম্মানজনক নয়। ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যাবে, ভাষা আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে ভাষাবিদ বা পন্ডিতরা যতটুকু না সফল হন তারচেয়ে অনেক বেসি সফল হন কবি-সাহিত্যিকরা। কারন, তারা মুক্ত চিন্তার মানুষ। তাদের কলম আবারিত। আর তাই সাহিত্যের উপর ভর করেই যুগে যুগে ভাষার উত্তরন ঘটেছে। পক্ষান্তরে ভাষাবিদ বা পন্ডিতজন কঠিন নিয়ম-কানুনের গন্ডিতে আবদ্ধ। নিয়মের গন্ডি পেরিয়ে নতুন কিছু ভাবতে গিয়ে তাঁরা ন্যায় অন্যায়ের ভাবনায় তাড়িত হন অহর্নিসি। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরি রচিত ***বাংলা বানানে অন্যায় হস্তক্ষেপ*** প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, *ভাষাতো কারো ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সম্পত্তি নয়, কেবল একালের মানুষেরও সম্পত্তি নয়, বহুকালের এবং অনাগত কালেরও; ওইখানে হাত দেওয়ার দুঃসাহসটা কেন?* ভাষা আকাস থেকে পড়েনি। ভাষা মানুষেরই সৃষ্টি। যুগে যুগে মানুষের প্রয়োজনেই এর পরিবর্তন হয়েছে। সময়ের প্রয়োজনেই মানুষ এই পরিবর্তন বা আধুনিকায়ন মেনে নিয়েছে। বাঙলা ভাষার ইতিহাসের দিকে তাকালেই একথার প্রমান মেলে। এখানে দুঃসাহস বা ভয় ভিতির কোন ব্যাপার নেই। ভাষা আধুনিকায়নের গতির প্রতি স্রদ্ধাসিল হয়ে বা বাস্তবতাকে মেনে নিতে হলে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রয়োজনে ব্যাকরন সঙস্কার করলেইবা ক্ষতি কি? ব্যাকরনতো কোন ঐসি গ্রন্থ নয় যে তাতে হাত দিলে হাবিয়া দোজখে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। ব্যাকরনতো ভাষার জন্য। আর ভাষাতো মানুষের জন্য।

তাই এখন বোধ হয় সময় এসেছে বাঙলা ভাষা আধুনিকায়নের। এটা সুধুই আধুনিকায়ন। পরিবর্তন বা সঙসোধন নয়। আর এই কাজটি করতে গিয়ে *ঈ, ঊ, ণ, শ, ং* এই পাঁচটি অক্ষর বাদ দিয়ে বাঙলা ভাষা চর্চা করাই ভাল। এই পাঁচটি অক্ষরের জন্যেই সাধারন মানুষকে সবচেয়ে বেসি বিভ্রান্ত হতে হয়। আর বৈপ্লবিক এই কাজটি বোধ হয় কোন সেমিনার, মিটিঙ বা সার্কুলার জারি করে সম্ভব হবেনা। এটা করতে হলে ওই পাঁচটি অক্ষর বাদ দিয়ে ভাষা চর্চার অভ্যেস করতে হবে। আতকে ওঠার কিছু নেই। সময়ই সুধু বলে দেবে এর সফলতা। এবঙ আনন্দের কথা, ইতোমধ্যে আমরা তেমন প্রচেষ্টার আলামত দেখতে পাচ্ছি। বাক-স্বাধিনতায় হস্তক্ষেপ বা ধমক দিয়ে কিছু বন্ধ করতে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে কোন দুর্বলতাকে ধামা চাপা দেবার অপচেষ্টা। মুখ বন্ধ করে দেবার প্রবনতা গোড়ামিকেই ধারন করে। এগিয়ে যাবার পথ বন্ধ করে দেয়। প্রস্ন উঠেছে বাঙলা বানানে হাত দেবার অধিকার কারো আছে কিনা? আগেই বলেছি, আমি কোন ভাষাবিদ বা পন্ডিত নই । একজন

সাধারন মানুষ । জন্মের পর একটি সাধারন সিসু যে অধিকারে মা সব্দটি উচ্চারন করে , একজন সাধারন স্রমজিবি মানুষ যে অধিকারে মাতৃভাষার জন্য বুকের রক্ত ঢেলে রাজপথে লুটিয়ে পড়ে, আমিও সেই অধিকারে আমার প্রানের বাঙলা ভাষাকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে নিতে চাই। আমার এ মতের সাথে একমত হওয়া বা দ্বিমত পোষন করা যার যার ইচ্ছে।

ওই অক্ষরগুলো বাদ দিয়েই আমার সেই চিত্রনাট্য থেকে লিখে ফেললাম আমার প্রথম উপন্যাস ***এখনো গর্ভে তোমার*** । তারপর একই ভাবে আরো দু'টি উপন্যাস ***তখন*** এবঙ ***কেন*** । এবঙ আরও পরে ইলেক্ট্রনিক সঙস্করন কাব্যগ্রন্থ ***আকাস রঙ স্বপ্ন*** । সবগুলোই এক এক করে বাজারে বের হল। ভবিষ্যতেও একইভাবে লেখালেখির কাজ চালিয়ে যেতে চাই। আমার লেখাগুলোই প্রমান করবে বানান নিয়ে আমার এই ভাবনা কতটা ধোপে টেকে।

২০.৪.২০০৩
কল্যানপুর, ঢাকা